**অধ্যায় ১**

**কম্পিউটার পরিচিতি**

আমাদের বর্তমান জীবনের অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ হচ্ছে কম্পিউটার। এটি এক ধরনের হিসাব বা গণনাকারী যন্ত্র যা আমাদের দৈনন্দিন অনেক কাজকে সহজ, নির্ভুল ও গতিশীল করেছে। কম্পিউটার (Computer) শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Computare' থেকে এসেছে যার অর্থ হলো গণনা, হিসাব বা চিন্তা করা। বর্তমান বিশ্ব তথ্য-প্রযুক্তিসহ সকল ক্ষেত্রেই যে দ্রুত উন্নতি করছে তার পেছনে কম্পিউটারের অবদান অপরিসীম। কম্পিউটারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে দিলে এটি জটিল সব কাজ মুহূর্তের মধ্যে করতে পারে যা আগে মানুষের করতে অনেক সময় লাগতো।

বেশ কিছু সুবিধার কারণে দিন দিন কম্পিউটারের ব্যবহার বেড়েই চলেছে। যেমন-

* কম্পিউটার দ্রুততার সাথে যেকোনো জটিল কাজ সম্পন্ন করতে পারে।
* কম্পিউটার বহু ধরনের কাজ করতে পারে। বাসায় বসে গান শোনা থেকে শুরু করে মহাকাশ গবেষণা পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই কম্পিউটারের ব্যবহার আছে।
* একবার কোনো কাজের নির্দেশনা দিলে কম্পিউটার তা প্রতিবারই নির্ভুলভাবে করতে পারে।
* যথাযথ বিদ্যুতের সংযোগ থাকলে একটি কম্পিউটার ক্লান্তিহীনভাবে কাজ করে যায়। সুপার কম্পিউটার ও সার্ভার জাতীয় কম্পিউটারগুলো প্রায় সারা বছরই চলে।
* কিছু ক্ষেত্রে কম্পিউটারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে দিলে তা নিজে থেকেই কাজ করতে পারে, মানুষের নিয়ন্ত্রণের আর দরকার হয় না।
* কম্পিউটার অনেক তথ্য একসঙ্গে সংরক্ষণ করতে পারে এবং প্রয়োজন হলে তা কাজে লাগাতে পারে।
* কম্পিউটার অতি সূক্ষ্ম কাজ করতে পারে যা মানুষের পক্ষে করা প্রায় অসম্ভব।
* কম্পিউটার কখনো আবেগ দিয়ে চিন্তা করে না। তাই যেকোনো কাজের ব্যাপারে সবসময় যৌক্তিক এবং বিশ্বাসযোগ্য সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

কম্পিউটার পরিচিতি

কম্পিউটার আবিষ্কারের ইতিহাস

তোমরা জানো যে, মানুষ তার প্রয়োজনের তাগিদেই কিছু আবিষ্কার বা তৈরি করে। হাজার হাজার বছর আগে মানুষ যখন হিসাব-নিকাশের কাজ করতো, তখন গণনার কাজ করতে প্রায়ই সমস্যার সম্মুখীন হতো। তাই মানুষ এমন কিছু তৈরি করার চেষ্টা করেছে যা দিয়ে জটিল ও সময়সাপেক্ষ কাজ খুব দ্রুত ও সহজে করা যাবে। কেউ হাতের কড়া, কেউ কাঠের ওপর দাগ টেনে সংখ্যা লিখে হিসাব করতো। অনেকে ছোটো পাথরের টুকরো গণনার কাজে ব্যবহার করতো।

এরই ধারাবাহিকতায় আবিষ্কৃত হয় 'অ্যাবাকাস' নামের গণনাকারী যন্ত্রটি। এটি দিয়ে সাধারণ গাণিতিক সমস্যা যেমন- যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের কাজ করা যেত। এটি এতই জনপ্রিয় হয় যে, আজও শিশুদের গণনা শেখানোর উপকরণ হিসেবে অ্যাবাকাস ব্যবহৃত হয়।

এরপর বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করে গেছেন কীভাবে এসব গণনাকারী যন্ত্রকে আরও উন্নত করা যায়। প্রায় চারশো বছর আগে জন নেপিয়ার ও ব্লেইজ প্যাসকেল আধুনিক ক্যালকুলেটর কেমন হতে পারে সে ব্যাপারে ধারণা দেন। এমনকি সে সময় ক্যালকুলেটরের মতো বেশ কিছু গণনাকারী যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। তবে সেগুলো দিয়ে সবসময় নির্ভুল ফলাফল পাওয়া যেত না।

১৮২৩ সালে গণিতের অধ্যাপক চার্লস ব্যাবেজ 'ডিফারেনস ইঞ্জিন' নামক একটি মেশিন তৈরির পরিকল্পনা করেন। মেশিনটির সাহায্যে কোনো গাণিতিক সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি তা মুদ্রণের ব্যবস্থাও ছিল। কয়েক বছর পর চার্লস ব্যাবেজ আরও উন্নত ও শক্তিশালী একটি মেশিনের পরিকল্পনা করেন যা 'অ্যানালাইটিক্যাল ইঞ্জিন' নামে পরিচিত। এটি এতই উন্নত ছিল যে, এর কিছু অংশের ধারণা আজও আধুনিক কম্পিউটারে ব্যবহার করা হয়। এ কারণেই চার্লস ব্যাবেজকে কম্পিউটারের জনক বলা হয়।

কম্পিউটার পরিচিতি

তার এই যন্ত্রের ক্রিয়াকৌশলের ওপর ভিত্তি করে আধুনিক কম্পিউটারের পথচলা শুরু হয়। ১৮৫০-১৯০০ পর্যন্ত অনেকেই বিদ্যুতচালিত গণনাকারী যন্ত্র তৈরির চেষ্টা করেন এবং সফলও হন। সে সময়ের যন্ত্রগুলো গণনার পাশাপাশি বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণও করতে পারত।

আধুনিক কম্পিউটার বিজ্ঞানের সূচনা হয় ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী অ্যালান টিউরিং-এর হাত ধরে। তিনিই প্রথম অ্যালগরিদমের ধারণা দেন। অ্যালগরিদম হচ্ছে ছোটো ছোটো কাজের ধারাবাহিকতায় বড় কোনো কাজ সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া। কম্পিউটার বিজ্ঞানে তাঁর অবদানকে চিরস্মরণীয় রাখতে প্রতি বছর কম্পিউটার বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা বিজ্ঞানীদের 'টিউরিং অ্যাওয়ার্ড' নামক পুরষ্কার দেওয়া হয়।

বিদ্যুতচালিত কম্পিউটার আবিষ্কারের পর থেকেই কম্পিউটার বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। ১৯৪৬ সালে জন মকলি এবং জন ইকার্ট নামক দুইজন বিজ্ঞানী মিলে একটি বিদ্যুৎচালিত কম্পিউটার তৈরি করেন যার নাম ছিল 'এনিয়াক'। এটি পৃথিবীর প্রথম পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার যা দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রোগ্রাম চালানো যেত। এর ওজন ছিল প্রায় ৩০ হাজার কেজি।

১৯৬০-এর দশকে ট্রানজিস্টর আবিষ্কারের মাধ্যমে কম্পিউটার আকারে ছোটো এবং দ্রুতগতিসম্পন্ন হতে থাকে। অ্যাপল, আইবিএম ও মাইক্রোসফটের মতো বিখ্যাত কোম্পানিগুলো ধীরে ধীরে এই শিল্পে বিপ্লব ঘটায়। ১৯৭১ সালে আমেরিকান প্রতিষ্ঠান ইন্টেল কর্পোরেশন প্রথম মাইক্রোপ্রসেসর আবিষ্কার করে। এর ফলে কম্পিউটারের ব্যবহার আরও বেড়ে যায়। মাইক্রোপ্রসেসর ব্যবহারের ফলে কম্পিউটারের কাজ করার গতি একদিকে যেমন বেড়ে যায়, অন্যদিকে এর দাম ও আকার কমতে থাকে। বর্তমানে যেসব কম্পিউটার বাজারে পাওয়া যায় সেগুলো অত্যন্ত আধুনিক ও শক্তিশালী, যা আমাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম আরও সহজ ও গতিশীল করছে।

কম্পিউটার পরিচিতি

কম্পিউটারের প্রকারভেদ

আকার, দাম, কাজ করার ক্ষমতা, মানুষের চাহিদা ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে বাজারে নানা প্রকারের কম্পিউটার পাওয়া যায়। বর্তমানে যেসব বিদ্যুৎচালিত ডিজিটাল কম্পিউটার রয়েছে সেগুলোকে মূলত ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক. সুপার কম্পিউটার (Super Computer):

পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী কম্পিউটার এটি।

১৯৬৪ সালে আবিষ্কৃত প্রথম সুপার কম্পিউটারের নাম সিডিসি-৬৬০০। সাধারণ কম্পিউটারের চেয়ে এটি হাজার হাজার গুণ বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন হয়। প্রতি সেকেন্ডে এসব কম্পিউটার শত শত কোটি গাণিতিক হিসাব সম্পন্ন করতে পারে। সাধারণত জটিল সব কাজ, যেমন- মহাকাশ বিষয়ক গবেষণা, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, খনিজ সম্পদ বিষয়ক বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইত্যাদি কাজে সুপার কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। আমরা ব্যক্তিগত কাজে যেসব কম্পিউটার ব্যবহার করি তাতে সাধারণত একটি প্রসেসর থাকলেও সুপার কম্পিউটারে কয়েক হাজার প্রসেসর ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সুপার কম্পিউটার হচ্ছে ফ্রন্টিয়ার (Frontier)

খ. মেইনফ্রেম কম্পিউটার (Mainframe Computer):

সুপার কম্পিউটারের তুলনায় আকারে ছোট এবং কম শক্তিশালী

কম্পিউটার হচ্ছে মেইনফ্রেম কম্পিউটার। এসব কম্পিউটারে

কয়েকশ প্রসেসর ব্যবহার করা হয়। একাধিক ইনপুট-আউটপুট

ডিভাইস আছে এতে, অর্থাৎ একই সঙ্গে অনেক মানুষ এসব

কম্পিউটারে কাজ করতে পারে। গবেষণা, জনসংখ্যা গণনা বা আদমশুমারি, বড় শিল্প কারখানার তথ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি কাজে মেইনফ্রেম কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। পৃথিবীর প্রথম বৈদ্যুতিক কম্পিউটার 'এনিয়াক'-ও এক ধরনের মেইনফ্রেম কম্পিউটার ছিল। বর্তমানে যেসব শক্তিশালী মেইনফ্রেম কম্পিউটার আছে তার মধ্যে আইবিএম জেড-১৭ (Z-17) অধিক পরিচিত।

গ. মিনি কম্পিউটার (Mini Computer): মেইনফ্রেম

কম্পিউটারের তুলনায় আকারে ছোট এবং কম শক্তিসম্পন্ন কম্পিউটার হচ্ছে মিনি কম্পিউটার। এতেও একাধিক প্রসেসর ব্যবহার করা হয়। একাধিক মানুষ এটি একসঙ্গে ব্যবহার করতে পারে। হাসপাতাল, ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিনি কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়।

কম্পিউটার পরিচিতি

ঘ. মাইক্রো কম্পিউটার (Micro Computer): মাইক্রোপ্রসেসর ব্যবহার করে বানানো হয় বলে এসব কম্পিউটারকে

মাইক্রো কম্পিউটার বলে। ব্যক্তি পর্যায়ে ব্যবহার উপযোগী করে এসব কম্পিউটার তৈরি করা হয়। অনেকে এসব কম্পিউটারকে পার্সোনাল কম্পিউটার (Personal Computer) বা পিসি বলে। এটি আকারে বেশ ছোট এবং হালকা হয়। কিছু কিছু মাইক্রো কম্পিউটার সহজে বহনও করা যায়। বাজারে বেশ কয়েক ধরনের মাইক্রো কম্পিউটার পাওয়া যায়। যথা-

১. ডেস্কটপ কম্পিউটার (Desktop Computer): টেবিল বা ডেস্কের ওপর রেখে ব্যবহার করা হয় বলে এদের ডেস্কটপ কম্পিউটার বলা হয়। বাসাবাড়ি, অফিস, স্কুল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে এসব মাইক্রো কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। এই বইয়ে ডেস্কটপ কম্পিউটার ও এর যন্ত্রাংশ নিয়েই বেশি আলোচনা করা হয়েছে।

২. ল্যাপটপ কম্পিউটার (Laptop Computer): এসব কম্পিউটার

ডেস্কটপ কম্পিউটারের চেয়ে আকারে ছোট এবং সহজে বহনযোগ্য হয়। বর্তমানে এই ধরনের কম্পিউটার সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। এসব কম্পিউটারের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে ব্যাটারি থাকে। যার কারণে কোথাও ঘুরতে গেলে, গাড়িতে, পার্কে যেকোনো জায়গায় রেখে এই কম্পিউটার ব্যবহার করা যায়।

৩. নোটবুক কম্পিউটার (Notebook Computer): লেখালেখির কাজে যে নোটবুক ব্যবহার করি এসব কম্পিউটার দেখতে ঠিক তেমনই। এসব কম্পিউটার ল্যাপটপ কম্পিউটারের চেয়েও আকৃতিতে আরেকটু ছোট এবং কম শক্তিশালী হয়। এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একে মোবাইলের বিকল্প হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। কাজ করার ক্ষমতার ভিত্তিতে বর্তমানে ট্যাবলেট কম্পিউটারের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। এতে টাচস্ক্রিন থাকলে স্মার্টফোনের মতো আলাদা কি-বোর্ড ও মাউসের প্রয়োজন হয় না।

৪. পকেট কম্পিউটার (Pocket Computer): নোটবুকের চেয়েও এই কম্পিউটার আকারে ছোট হয়। মূলত পকেটে বহন করা যায় বলে এসব কম্পিউটারকে পকেট কম্পিউটার বলে। স্মার্টফোনের প্রচলন বেড়ে যাওয়ায় এ ধরনের কম্পিউটার কম দেখা যায়।

এছাড়া আমরা যে স্মার্টফোন ব্যবহার করি সেটিও এক ধরনের মাইক্রো কম্পিউটার। বর্তমানে কিছু পরিধানযোগ্য ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস যেমন- স্মার্ট ঘড়ি, ফিটনেস ট্র্যাকার পাওয়া যায়। এগুলোও মাইক্রো কম্পিউটারের বিশেষ রূপ।

অনুশীলনী

ক. প্রতিটি তথ্যের পাশে সত্য হলে 'স' আর মিথ্যা হলে 'মি' লেখো।

১. মানুষ কম্পিউটারের চেয়েও সূক্ষ্ম জিনিস নিয়ে চিন্তা করতে পারে।

২. চার্লস ব্যাবেজ ১৮২৩ সালে 'অ্যানালাইটিক্যাল ইঞ্জিন' তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন

৩. ১৯৬০-এর দশকে ট্রানজিস্টর আবিষ্কৃত হয়।

৪. বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ল্যাপটপ কম্পিউটার ব্যবহার হয়।

৫. স্মার্ট ওয়াচ এক ধরনের সুপার কম্পিউটার।

খ. সঠিক শব্দ ব্যবহার করে নিচের বাক্যগুলো সম্পূর্ণ করো।

• ৩০,০০০ বুদ্ধি গান শোনার আমেরিকার ৩,০০০ আবেগ মুদ্রণের ইংল্যান্ডের মেইনফ্রেম

১. কম্পিউটার কখনো দিয়ে চিন্তা করে না।

২. ডিফারেনস ইঞ্জিন দিয়ে গাণিতিক সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি তা ব্যবস্থাও ছিল।

৩. আধুনিক কম্পিউটার বিজ্ঞানের সূচনা হয়। বিজ্ঞানী অ্যালান টিউরিং-এর হাত ধরে।

৪. 'এনিয়াক'-এর ওজন ছিল প্রায় কেজি।

৫. আইবিএম জেড-১৭ এক ধরনের কম্পিউটার।

গ. সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

১. Computare শব্দের অর্থ কী? কম্পিউটারের যেকোনো দুইটি সুবিধা লেখো।

২. সবচেয়ে শক্তিশালী কম্পিউটারের নাম কী? এই ধরনের কম্পিউটার কোন কোন কাজে ব্যবহার করা হয়?

৩. 'টিউরিং অ্যাওয়ার্ড' কী? এটি কাদের দেওয়া হয়?

৪. ল্যাপটপ কম্পিউটার কোন কোন দিক দিয়ে ডেস্কটপ কম্পিউটারের চেয়ে আলাদা?

৫. তিন ধরনের মাইক্রো কম্পিউটারের নাম বলো। এর মধ্যে কোনটি বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়?

ঘ. বাড়ির কাজ: অভিভাবকের সহায়তায় কম্পিউটারের বিবর্তনের ইতিহাস একটি রঙিন পোস্টারে ধারাবাহিকভাবে লিখে নিয়ে আসো। পাশাপাশি যেসব জায়গায় ছবি যুক্ত করা সম্ভব সেখানে ছবি এঁকে দাও।

**অধ্যায় ২**

**কম্পিউটারের কার্যপদ্ধতি**

আমরা যখন কোনো কাজ করতে যাই তখন শুরুতে কাজটি কীভাবে করব সে ব্যাপারে চিন্তা করি। পরে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে কাজটি সমাধানের চেষ্টা করি। এক্ষেত্রে কিছু কাজ আমাদের ধারাবাহিকভাবে করতে হয়। তেমনি কম্পিউটারও যখন কোনো কাজ করে তখন ধারাবাহিকভাবে এর যন্ত্রাংশগুলো ব্যবহার করে কাজটি সম্পন্ন করে।

কম্পিউটার প্রধানত দুইটি অংশ দিয়ে মানুষের মতো তার সকল কাজ করে থাকে। যথা-

১. হার্ডওয়্যার (যেসব যন্ত্রপাতি দিয়ে কম্পিউটার গঠিত হয়)

২. সফটওয়‍্যার (যেকোনো কাজের অনেকগুলো ধারাবাহিক নির্দেশনা, যা মেনে হার্ডওয়‍্যারগুলো কাজটি সম্পন্ন করে থাকে)

'এনিয়াক' তৈরির পেছনে অন্যতম কারিগর ছিলেন বিখ্যাত গণিতবিদ জন ভ্যান নিউম্যান। তিনি কম্পিউটারের কাজ করার পদ্ধতি নিয়ে একটি ধারণা দেন যা আজও ব্যবহৃত হচ্ছে। আমরা যখন কম্পিউটারে কোনো কাজ করতে যাই, তখন পুরো ঘটনাটি তিনটি ধাপে ঘটে।

প্রথম ধাপ

ইনপুট: ধরে নাও তুমি ৮ ও ৯-এর গুণের ফলাফল বের করতে চাও। এজন্য তুমি কম্পিউটারের ক্যালকুলেটর অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করবে। তাহলে-

• শুরুতে কম্পিউটারের ক্যালকুলেটর অ্যাপ্লিকেশনটি চালু করো।

• গুণের কাজটি করানোর জন্য তোমার একটি ইনপুট ডিভাইসের প্রয়োজন যা দিয়ে তুমি কম্পিউটারকে গুণ করার নির্দেশনা দিবে। এখন কি-বোর্ডের সাহায্যে আমরা তথ্য ইনপুট দিব।

• এবার চিন্তা করো তুমি কয় ধরনের ইনপুট দিচ্ছ। কম্পিউটার সাধারণত দুই ধরনের ইনপুট নেয়।

তথ্য বা উপাত্ত: ৮৩৯

নির্দেশনা: গুণের কাজ করা

• এবার তুমি কি-বোর্ডের সাহায্যে ৮ ৯ লিখলে। কম্পিউটারে গুণ চিহ্ন x এর বদলে হিসেবে কাজ করে। এই দুই ধরনের ইনপুট মিলিয়েই তুমি কম্পিউটারে ইনপুটের কাজটি করলে।

কম্পিউটারের কার্যপদ্ধতি

দ্বিতীয় ধাপ

প্রক্রিয়াকরণ বা প্রসেসিং: এই ধাপে তোমার দেওয়া তথ্য এবং নির্দেশনা নিয়ে কম্পিউটার তা প্রক্রিয়া বা প্রসেস করে। এখানে কম্পিউটারের কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ বিভাগ বা সিপিইউ কয়েকটি ভাগে কাজটি করে।

• গণনা ও যুক্তি বিভাগ (Arithmatic & Logic Unit): এখানে ইনপুটের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন হয়।

অর্থাৎ তুমি যে তথ্য এবং নির্দেশনা দিলে সে অনুযায়ী গুণের কাজ এই বিভাগটি করবে। তার মানে, ৮ ও ৯-এর গুণফল যে ৭২ তা এই বিভাগ হিসাব করে বের করে।

• নিয়ন্ত্রণ বিভাগ (Control Unit): এই অংশটি কম্পিউটারের সকল কাজ দেখভাল করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা

দেওয়ার কাজটি করে। অর্থাৎ, এই অংশটি তোমার গুণের ইনপুট নেওয়া, গণনা ও যুক্তি বিভাগ ঠিকমতো ফলাফল তৈরি করছে কিনা তা নিশ্চিত করে এবং সবশেষে তোমার কাজের ফলাফল আউটপুট ডিভাইসের মাধ্যমে দেখানোর সুযোগ করে দেয়।

• স্মৃতি বিভাগ (Memory Unit): যে গুণের কাজটি হলো তা এই বিভাগ তার স্মৃতি বা মেমোরিতে জমা করে।

তোমরা জানো যে, কম্পিউটারের র‍্যাম যেকোনো কিছুর তথ্য, নির্দেশনা অস্থায়ীভাবে রাখে। আর হার্ড ডিস্ক বা রম জাতীয় ডিভাইস সেগুলো স্থায়ীভাবে স্মৃতিতে জমা রাখে। তোমার গুণের তথ্য, নির্দেশনা ও ফলাফল কোন মেমোরিতে যাবে তা স্মৃতি বিভাগ তোমার দেওয়া নির্দেশনা অনুযায়ী নির্বাচন করে।

তৃতীয় ধাপ

আউটপুট: তুমি এই ধাপে এসে তোমার দেওয়া গুণের ফল আউটপুট ডিভাইসের মাধ্যমে দেখতে বা শুনতে পাবে। অর্থাৎ, তোমার আউটপুট ডিভাইস যদি মনিটর হয় তাহলে তুমি তাতে ৮৯ = ৭২ দেখতে পাবে। পুরো জিনিসটি প্রসেসিংয়ের নিয়ন্ত্রণ বিভাগের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

**অনুশীলনী**

ক. প্রতিটি তথ্যের পাশে সত্য হলে 'স' আর মিথ্যা হলে 'মি' লেখো।

১. জন ভ্যান নিউম্যান একজন ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন।

২. কম্পিউটারের যেকোনো কাজ মূলত তিনটি ধাপে হয়।

৩. কি-বোর্ড এক ধরনের আউটপুট ডিভাইস।

৪. নিয়ন্ত্রণ বিভাগ কম্পিউটারের সকল কাজ দেখভাল করে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়

৫. কম্পিউটারের র‍্যাম যেকোনো কিছুর তথ্য, নির্দেশনা স্থায়ীভাবে রাখে।

খ. সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

১. কম্পিউটারের প্রধান অংশ কয়টি এবং কী কী?

২. কম্পিউটার যেকোনো কাজ কয়টি এবং কী কী ধাপে করে থাকে?

৩. আমরা কম্পিউটারে যে ইনপুট দেই তা কয় ধরনের এবং কী কী?

৪. কম্পিউটারের প্রসেসিং ইউনিটে কয়টি বিভাগ আছে? তাদের নাম লেখো।

৫. স্মৃতি বিভাগে কয় ধরনের স্টোরেজ ডিভাইস কাজ করে?

গ. শ্রেণির কাজ: শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রথমে ইনপুট-সিপিইউ-আউটপুটের ছবিটি এঁকে কম্পিউটারের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দিবেন। তারপর যেকোনো একটি সহজ গাণিতিক সমস্যা দিয়ে কম্পিউটারের কোন ধাপে কোন কাজটি হবে তা ধারাবাহিকভাবে বোঝাবেন। এরপর একে একে প্রত্যেক শিক্ষার্থী বোর্ডের সামনে গিয়ে কাজটি আবার করে দেখাবে।

**অধ্যায় ৩**

**কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ**

কম্পিউটার যে কঠিন কঠিন গাণিতিক হিসাব-নিকাশ দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে করে, তা কিন্তু একটি ডিভাইসের বা যন্ত্রের মাধ্যমে হয় না। বেশকিছু যন্ত্রাংশ আছে যারা সবাই মিলে একটি কাজ করে। কিছু যন্ত্রাংশ কম্পিউটারের ভেতরে থাকে, আবার কিছু বাইরে থাকে। কিছু যন্ত্রাংশ ছাড়া কম্পিউটারের কথা চিন্তা করা যায় না। আবার কিছু যন্ত্রাংশ আমরা বিশেষ প্রয়োজনে মাঝে মধ্যে ব্যবহার করি। কম্পিউটার এবং এর আনুষঙ্গিক সকল যন্ত্রপাতিকে হার্ডওয়্যার বলে। এ অধ্যায়ে আমরা কম্পিউটার এবং এর আনুষঙ্গিক কিছু হার্ডওয়্যার সম্পর্কে জানব।

কম্পিউটার ব্যবহারের সময় তথ্য ও নির্দেশনা ইনপুট দিতে কিছু যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। এদেরকে ইনপুট ডিভাইস বলা হয়।

আবার কিছু ডিভাইস আছে যেগুলো কম্পিউটারে করা কাজের ফলাফল দেখাতে সহায়তা করে। এদেরকে আউটপুট ডিভাইস বলে। বর্তমানে কিছু হার্ডওয়‍্যার আছে যেগুলো একই সাথে ইনপুট এবং আউটপুট ডিভাইসের কাজ করে।

এর বাইরেও কিছু যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ আছে যেগুলো তথ্য বা নির্দেশনা সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াকরণ করে থাকে।

কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ

ইনপুট ডিভাইস

আমরা কাজের জন্য যেসব ডিভাইসের সাহায্যে কম্পিউটারে তথ্য ও নির্দেশনা দেই সেগুলো ইনপুট ডিভাইস নামে পরিচিত। এখানে বেশ কয়েকটি পরিচিত ইনপুট ডিভাইস সম্পর্কে তুলে ধরা হলো-

কি-বোর্ড (Keyboard): এটি কম্পিউটারে কিছু

লিখতে বা নির্দেশনা দিতে ব্যবহৃত একটি বহুল পরিচিত ইনপুট ডিভাইস। কি-বোর্ড তারছাড়া অথবা তারের সাহায্যে কম্পিউটারের সাথে যুক্ত হতে পারে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই ডিভাইসটি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানব।

মাউস (Mouse): কম্পিউটারের কাজে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ইনপুট

ডিভাইস হচ্ছে মাউস। মাউস দিয়ে খুব দ্রুত কম্পিউটার পরিচালনা করা যায়। এটিও কি-বোর্ডের মতোই তার বা তারছাড়া যুক্ত হতে পারে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই ইনপুট ডিভাইসটি নিয়েও বিস্তারিত জানব।

ক্যামেরা (Camera): ক্যামেরা হলো ছবি তোলা বা ভিডিও করার কাজে

ব্যবহৃত এক ধরনের ইনপুট ডিভাইস। ভিডিও কলের মাধ্যমে কারো সাথে যোগাযোগ করার সময় আমরা ক্যামেরা ব্যবহার করি। কম্পিউটারের সাথে আমরা বিশেষ এক ধরনের ছোট ক্যামেরা ব্যবহার করি যাকে ওয়েবক্যাম (Webcam) বলে। ওপরের দুটি ডিভাইসের মতো এটিও তার বা তারছাড়া উভয় ধরনেরই পাওয়া যায়।

মাইক্রোফোন (Microphone): মাইক্রোফোন হচ্ছে এক ধরনের

ইনপুট ডিভাইস যার সাহায্যে কম্পিউটারে শব্দ ইনপুট দেওয়া হয়। কারো সাথে অডিও বা ভিডিও কলে কথা বলার সময় আমরা এই ইনপুট ডিভাইসটি ব্যবহার করি। বর্তমানে তারসহ এবং তারছাড়া দুইরকম মাইক্রোফোনই বাজারে পাওয়া যায়।

কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ

বারকোড রিডার (Barcode Reader): এটি এক ধরনের ইনপুট ডিভাইস যা

অনেকটা স্ক্যানারের মতোই কাজ করে। বই বা কোনো পণ্যের গায়ে আমরা প্রায়ই কিছু পাশাপাশি লম্বা রেখার মতো দাগ দেখতে পাই। একে বারকোড বলে। এতে কিউআর কোডের মতোই অনেক তথ্য যেমন- পণ্যের নাম, দাম, তৈরির তারিখ ইত্যাদি থাকে যা বারকোড রিডারের সাহায্যে স্ক্যান করলে পাওয়া যায়। আধুনিক দোকানে বা সুপার শপে এর ব্যবহার দেখা যায়।

স্ক্যানার (Scanner): স্ক্যানার হচ্ছে এক ধরনের ইনপুট ডিভাইস যা দিয়ে কোনো ছবি বা লেখার কপি বা প্রতিলিপি তৈরি করা যায়। যদি কোনো বইয়ের বিশেষ কোনো তথ্য বা লেখার কপি প্রয়োজন হয় তবে স্ক্যানারের সাহায্যে আমরা তা স্ক্যান করে নিতে পারি। স্ক্যান করা তথ্য পরবর্তীতে কম্পিউটারে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করা যায়।

জয়স্টিক (Joystick): এটি কম্পিউটারে গেম খেলার জন্য বিশেষ এক ধরনের ইনপুট ডিভাইস। কি-বোর্ড এবং মাউসের সাহায্যে গেম খেলা গেলেও জয়স্টিক দিয়ে তুলনামূলক সহজে গেমের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

আউটপুট ডিভাইস

আমরা কম্পিউটারের কাজের ফলাফল যেসব ডিভাইসের সাহায্যে পাই, তাদেরকে আউটপুট ডিভাইস বলে। এখানে বেশ কয়েকটি পরিচিত আউটপুট ডিভাইস সম্পর্কে তুলে ধরা হলো-

মনিটর (Monitor): যে ডিভাইসের সাহায্যে আমরা কম্পিউটারের কোনো কাজের ফলাফল দেখতে পাই, তাকে মনিটর বলে। এটিকে কম্পিউটারের প্রধান আউটপুট ডিভাইস বলা যায়। মনিটরের স্ক্রিনে অসংখ্য ক্ষুদ্র চারকোনা বাতি থাকে যাদেরকে পিক্সেল (Pixel) বলে। এসব পিক্সেলে বিভিন্ন রং দেখা যায় বলেই পুরো স্ক্রিনে আমরা লেখা, ছবি, ভিডিও ইত্যাদি দেখতে পাই।

কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ

প্রিন্টার (Printer): প্রিন্টার একটি পরিচিত আউটপুট ডিভাইস। কম্পিউটারের কোনো কাজ যদি কাগজে ছাপার প্রয়োজন হয় তখন প্রিন্টার ব্যবহার করা হয়। প্রিন্টারের সাহায্যে সাদাকালো ও রঙিন দুই ধরনের ছবিই প্রিন্ট করা যায়।

স্পকার (Speaker): স্পিকার একটি প্রয়োজনীয় আউটপুট ডিভাইস। শব্দ শোনা দরকার এমন কাজের ক্ষেত্রে আমরা স্পিকার ব্যবহার করি (যেমন- গান, ভিডিও ইত্যাদি শোনা)। বর্তমানে তার বা তারছাড়া উভয় ধরনের স্পিকারই পাওয়া যায়।

প্রজেক্টর (Projector): কম্পিউটারে চলা কোনো কাজ যখন আমরা বড় পর্দা বা স্ক্রিনে দেখতে চাই তখন এই আউটপুট ডিভাইসটি ব্যবহার করা হয়। অনেক মানুষের একসাথে বসে কম্পিউটারে কোনো কাজ করা বা দেখার প্রয়োজন হলে প্রজেক্টরের প্রয়োজন পড়ে। এর সাথে একটি রিমোট থাকে যা দিয়ে প্রজেক্টরটি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ইনপুট-আউটপুট ডিভাইস

টাচ স্ক্রিন (Touch Screen): বর্তমানে কিছু স্পর্শকাতর (Touch sensitive) ডিসপ্লে বা মনিটর পাওয়া যায় যেগুলোতে আমরা মাউসের মতো কাজ হাতের ছোঁয়ার সাহায্যে করতে পারি। আবার কাজের ফলাফল ওই ডিসপ্লেতেই দেখতে পারি। অর্থাৎ এগুলো একই সঙ্গে ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস হিসেবে কাজ করে। স্মার্টফোন, ট্যাবলেট কম্পিউটার ইত্যাদির ডিসপ্লে এই প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি হয়।

হেডফোন (Headphone): এটি একটি পরিধানযোগ্য স্পিকার যা একজন মানুষের

শব্দ শোনার উপযোগী করে বানানো হয়। এতে দুইটি ছোট স্পিকার থাকে যেগুলো আমাদের কানের ওপর বসানো যায়। এসব হেডফোনে একই সাথে মাইক্রোফোন থাকে বলে এটি ইনপুট ডিভাইসের কাজও করে।

আবার এখনকার ল্যাপটপ, স্মার্টফোন, ট্যাবলেট ইত্যাদিতে টাচস্ক্রিন ও স্পিকার একসাথেই থাকে।

কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ

সংরক্ষণ (Storage) ডিভাইস

আমরা কম্পিউটারে যে কাজ করি তার মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য বা ফাইল সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। এই সংরক্ষণের কাজটি যেসকল ডিভাইস করে থাকে তাদেরকে স্টোরেজ ডিভাইস বলে।

র‍্যাম (RAM): র‍্যাম (RAM বা Random Access Memory) হলো এক ধরনের

অস্থায়ী স্টোরেজ ডিভাইস। কম্পিউটার প্রতি মুহূর্তে যেসব কাজ করে, সেগুলো বার বার ব্যবহার করার প্রয়োজন হলে একটি দ্রুতগতির অস্থায়ী স্টোরেজ বা তথ্য সংরক্ষণ ডিভাইসের দরকার হয়। সেজন্য র‍্যাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। র‍্যাম যত শক্তিশালী হয়, একটি কম্পিউটারও তত দ্রুতগতিসম্পন্ন হয় প্রসেসরের যেকোনো তথ্য বা নির্দেশনার দরকার হলে তা র‍্যামের মাধ্যমে নেয়। অস্থায়ী স্টোরেজ হওয়ায় কম্পিউটার বন্ধ করে দিলে র‍্যামে থাকা সকল তথ্য মুছে যায়।

রম (ROM): রম (ROM বা Read Only Memory) হলো এক ধরনের স্থায়ী মেমোরি বা স্টোরেজ ডিভাইস কম্পিউটার চালানোর জন্য কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশনা এবং তথ্য এতে সংরক্ষিত থাকে। স্থায়ী স্টোরেজ হওয়ায় কম্পিউটার বন্ধ করলেও এসব তথ্য ও নির্দেশনা মুছে যায় না।

হার্ড ডিস্ক (Hard Disc): কম্পিউটারের যাবতীয় তথ্য, ছবি, ভিডিও, ফাইল ইত্যাদি

এখানে সংরক্ষণ করা হয়। এটি একটি ধরনের স্থায়ী মেমোরি বা স্টোরেজ ডিভাইস। স্থায়ী স্টোরেজ হওয়ায় এসব ফাইল বা তথ্য পরবর্তীতে যেকোনো সময় আমরা ব্যবহার করতে পারি। স্মার্টফোনগুলো আকারে ছোটো হওয়ায় তথ্য সংরক্ষণের জন্য এর রমই হার্ড ডিস্কের কাজ করে।

পেন ড্রাইভ (Pen Drive): এটি এক ধরনের স্থায়ী স্টোরেজ ডিভাইস। আকারে ছোট

হওয়ায় এটি সহজে যেকোনো জায়গায় বহন করা যায়। তাছাড়া এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে ফাইল আদান-প্রদান করার জন্যও এটি ব্যবহৃত হয়।

মেমোরি কার্ড (Memory Card): এটি খুবই ছোটো এক ধরনের স্থায়ী স্টোরেজ

ডিভাইস। আমরা যেসব ধাতব মুদ্রা ব্যবহার করি, মেমোরি কার্ড সে রকম ছোট আকারের হয়। এটি মোবাইল বা ল্যাপটপে যুক্ত করে ব্যবহার করতে হয়।

কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ

প্রক্রিয়াকরণ (Processing) ডিভাইস

প্রসেসর (Processor): আমরা ইনপুট ডিভাইসের মাধ্যমে

কম্পিউটারে তথ্য ও নির্দেশনা ইনপুট দেই এবং আউটপুট ডিভাইসের মাধ্যমে তা আউটপুট হিসেবে দেখতে পাই। মাঝে একটি যন্ত্রাংশ আছে যা আমাদের তথ্য ও নির্দেশনা ইনপুট হিসেবে নিয়ে কাজ করে এবং কাজের ফলাফল আউটপুট ডিভাইসের মাধ্যমে দেখায়। যে যন্ত্রাংশ মধ্যবর্তী এই কাজ করে তাকে প্রসেসর বলে। যে কম্পিউটারের প্রসেসর যত শক্তিশালী সেই কম্পিউটার তত শক্তিশালী। তোমরা আগের অধ্যায়ে প্রক্রিয়াকরণের তিনটি বিভাগের ব্যাপারে জেনে এসেছ। এগুলো সবই প্রসেসরের ভেতরে থাকে। কম্পিউটারে যেকোনো কাজের জন্য প্রসেসর দরকার হয় বলে এটি সবসময় সচল থাকে। বিরতিহীনভাবে কাজ করে বলে প্রসেসর বেশ গরম হয়ে যায়। তাই প্রসেসরকে ঠান্ডা করার জন্য এর সাথে আলাদা করে একটি ফ্যান যুক্ত করা হয়।

মাদারবোর্ড (Motherboard)

সিপিইউ-এর ভেতরে থাকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ এটি। কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট বা সিপিইউ-এর ভেতরে যত যন্ত্রাংশ আছে, তার প্রায় সবগুলোই কোনো না কোনোভাবে মাদারবোর্ডের মাধ্যমে একে অপরের সাথে যুক্ত হয়। কম্পিউটারের সকল প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ যেন সঠিকভাবে কাজ করতে পারে তা নিশ্চিত করাই মাদারবোর্ডের কাজ। মাদারবোর্ড সাধারণত দুই রকমের হয়। যথা-

১. ইন্টিগ্রেটেড মাদারবোর্ড (Integrated Motherboard): এই ধরনের মাদারবোর্ডে প্রতিটি উপকরণ যুক্ত করার জন্য যেমন

আলাদা আলাদা পোর্ট থাকে, তেমনি মাদারবোর্ডটি সিপিইউ-এর সাথে যুক্ত করার জন্যেও আলাদা পোর্ট থাকে। তাই প্রসেসর, র‍্যাম ইত্যাদি যেকোনো একটি উপকরণ নষ্ট হয়ে গেলে বা যেকোনো কারণে পরিবর্তন করতে চাইলে খুব সহজেই তা পোর্ট থেকে খুলে পরিবর্তন করা যায়। এমনকি মাদারবোর্ডটিও চাইলে খুলে পরিবর্তন করা যায়। ডেস্কটপ, ল্যাপটপে সাধারণত এই ধরনের মাদারবোর্ড ব্যবহার করা হয়।

২. নন-ইন্টিগ্রেটেড মাদারবোর্ড (Non-integrated Motherboard): এই মাদারবোর্ডগুলোতে সকল যন্ত্রাংশ

স্থায়ীভাবে যুক্ত করা থাকে। এতে করে মাদারবোর্ডের আকৃতি অনেক ছোট হয়। তবে এতে থাকা কোনো যন্ত্রাংশ নষ্ট হলে বা পরিবর্তন করতে চাইলে তা আলাদাভাবে করা যায় না, পুরো মাদারবোর্ডটি পরিবর্তন করতে হয়।

কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ

সিস্টেম ইউনিট

মাদারবোর্ড এবং এর সাথে থাকা প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ, সিপিইউকে ঠান্ডা রাখার জন্য কুলিং ফ্যানসহ ডেস্কটপ কম্পিউটারের যাবতীয় যন্ত্রাংশ একটি বাক্সের ভেতরে থাকে। একে সিস্টেম ইউনিট বলে। সাধারণত সিপিইউ বলতে আমরা এই বাক্সটিকে মনে করি। ল্যাপটপে বা আরও ছোট মাইক্রো কম্পিউটারে সিস্টেম ইউনিট বলে আলাদা কোনো বাক্স থাকে না।

কেসিং: সম্পূর্ণ সিস্টেম ইউনিটকে ধারণ করার জন্য ব্যবহৃত বাক্স। এটি কম্পিউটারের যন্ত্রাংশগুলোকে সুরক্ষিত রাখে।

বিদ্যুৎ সংযোগ পোর্ট: কম্পিউটারের বিদ্যুৎ সংযোগ তারের জন্য নির্ধারিত পোর্ট।

বিদ্যুৎ সংযোগ কুলিং ফ্যান: কম্পিউটারের বিদ্যুৎ সংযোগ ইউনিটকে ঠান্ডা রাখার কাজে ব্যবহৃত আলাদা ফ্যান।

সিস্টেম ইউনিট কুলিং ফ্যান: সম্পূর্ণ সিস্টেম ইউনিটকে ঠান্ডা রাখার কাজে ব্যবহৃত ফ্যান।

প্যারালাল পোর্ট: ২৫টি ছিদ্রসংবলিত একটি পোর্ট। প্রিন্টার, স্ক্যানার ইত্যাদি ডিভাইস সংযোগের সময় এই পোর্ট ব্যবহার করা হয়।

ডিভিডি ড্রাইভ: এতে ডিভিডি বা সিডি চালানোর জন্য ব্যবস্থা থাকে। গোলাকার সিডি বা ডিভিডিতে থাকা তথ্য, ছবি বা ভিডিও এই ড্রাইভের সাহায্যে কম্পিউটারে দেখা যায়।

সিগন্যাল বাতি: একটি বাতি যা জ্বলা-নেভার মাধ্যমে কম্পিউটার চালু আছে কিনা তা বোঝা যায়। অনেক কেসিং-এ পাওয়ার সুইচেই এই বাতিটি থাকে, আলাদা করে দেওয়া থাকে না।

ইউএসবি পোর্ট: পেন ড্রাইভ, কি-বোর্ড, মাউস, জয়স্টিক ইত্যাদি কম্পিউটারের সাথে যুক্ত করার জন্য এসব সংযোগ পোর্ট ব্যবহার হয়। কেসিং-এর সামনে এবং পেছনে এরকম বেশ কিছু পোর্ট থাকে।

অডিও পোর্ট: স্পিকার, হেডফোন ইত্যাদি অডিও ডিভাইস যুক্ত করার জন্য থাকে অডিও পোর্ট। পুরোনো কিছু কেসিং-এ শব্দ শোনা এবং গ্রহণ করার জন্য আলাদা দুটি পোর্ট থাকলেও আধুনিক কেসিং-এ একটি পোর্ট থাকে। এতে হেডফোন যুক্ত করে দুইটি কাজই করা যায়।

ভিজিএ পোর্ট: মনিটর টিভি, প্রজেক্টর ইত্যাদি আউটপুট ডিভাইস যুক্ত করার কাজে ব্যবহৃত পোর্ট।

এইচডিএমআই পোর্ট: এটি ভিজিএ পোর্টের মতোই কাজ করে। তবে এটি দ্রুতগতির হওয়ায় উচ্চমানের ভিডিও আরও স্পষ্টভাবে আউটপুট পাওয়া যায়।

সম্প্রসারণ (Expansion) স্লট: এর মাধ্যমে কম্পিউটারে অতিরিক্ত স্টোরেজ প্রয়োজন পরলে বাইরে থেকে হার্ড ডিস্ক যুক্ত করা যায়।

বর্তমানে তারছাড়া প্রযুক্তি যেমন- ব্লুটুথ, ওয়াইফাই ইত্যাদি থাকায় সিস্টেম ইউনিটের অনেক পোর্টই এখন ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।

কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ

নেটওয়ার্কিং ডিভাইস

কম্পিউটার জগতে নেটওয়ার্ক হচ্ছে তার বা তারবিহীন এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে মোবাইল, কম্পিউটার ইত্যাদি বৈদ্যুতিক ডিভাইস একে অপরের সাথে যুক্ত হয়। নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার মাধ্যমে পৃথিবীর সবাই একে অপরের সাথে যুক্ত হয়। আমরা যে ইন্টারনেটের কথা বলি, সে ইন্টারনেটে যুক্ত হতে গেলে কিন্তু আমাদের কোনো না কোনো নেটওয়ার্কিং ডিভাইস প্রয়োজন। কিছু ডিভাইস তার দিয়ে আবার কিছু ডিভাইস তারহীন প্রযুক্তির মাধ্যমে নেটওয়ার্ক তৈরি অথবা কোনো নেটওয়ার্কে যুক্ত হতে সাহায্য করে। নিচে কিছু প্রচলিত নেটওয়ার্কিং ডিভাইস সম্পর্কে তুলে ধরা হলো-

অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক কার্ড (Internal Network Card):

ডেস্কটপ কম্পিউটারকে ইন্টারনেট বা অন্য কোনো নেটওয়ার্কে যুক্ত করতে এই যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হয়। এটি সিস্টেম ইউনিটের ভেতরে থাকে।

ইন্টারনেট মডেম (Internet Modem): নেটওয়ার্ক কার্ড নেই এমন

কম্পিউটারকে কোনো নেটওয়ার্কে যুক্ত করতে এই ডিভাইসটি ব্যবহার করা হয়। এটি সাধারণত ইউএসবি পোর্টের মাধ্যমে কম্পিউটারে যুক্ত হয়।

হাব (Hub): মাউস, কি-বোর্ডের মতো একাধিক ডিভাইস একসাথে

যুক্ত করতে চাইলে হাব ব্যবহার হয়। যখন প্রয়োজনের তুলনায় সংযোগকারী পোর্ট কম থাকে, তখন অতিরিক্ত ডিভাইসগুলোকে যুক্ত করতে হাব ব্যবহার করা হয়। ল্যাপটপ, ডেস্কটপ কম্পিউটারে আমরা অনেকেই ইউএসবি হাব ব্যবহার করি।

রাউটার (Router): Route মানে পথ। একাধিক কম্পিউটার বা ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসে যখন আমরা একটি উৎস থেকে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে চাই, তখন রাউটার ব্যবহার করি। ইন্টারনেট সংযোগের এক প্রান্ত রাউটারের সাথে যুক্ত করার পর তার বা তারহীনভাবে একাধিক ডিভাইসে ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায়। রাউটারের সুবিধা হচ্ছে এটি একই সাথে তার দিয়ে (কম্পিউটার) ও তারহীনভাবে (মোবাইল) দুই বা ততোধিক ডিভাইসকে ইন্টারনেট ব্যবহার করার সুযোগ দেয়।

রিপিটার (Repeater): রাউটার থেকে বা ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক থেকে একটু দূরে

থাকলে অনেকসময় পর্যাপ্ত গতির ইন্টারনেট পাওয়া যায় না। সেজন্য রিপিটার ব্যবহার করা হয়। এটি রাউটারের থেকে ইন্টারনেট সিগন্যাল নিয়ে তা হুবহু তারহীনভাবে আবার ছড়িয়ে দেয়। ফলে আগে যতটুকু জায়গায় ইন্টারনেট ব্যবহার করা যেত, এখন তারচেয়ে আরও বেশি জায়গায় তুলনামূলক দ্রুতগতিতে ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায়।

কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ

ল্যাপটপ (Laptop) কম্পিউটার

যত ধরনের মাইক্রো কম্পিউটার বাজারে পাওয়া যায়, তার মধ্যে ল্যাপটপ কম্পিউটার খুবই জনপ্রিয়। বর্তমান বিশ্বে কম্পিউটারের মধ্যে ল্যাপটপ কম্পিউটারই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। আকারে ছোট এবং সহজে বহনযোগ্য হওয়ায় মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এই ধরনের কম্পিউটারের ব্যবহার বেড়েই চলেছে। ভেতরে ব্যাটারি থাকায় ল্যাপটপকে ডেস্কটপ কম্পিউটারের মতো সবসময় বিদ্যুৎ সংযোগের সাথে যুক্ত করে রাখার দরকার হয় না।

ডেস্কটপ কম্পিউটারে কি-বোর্ড, মাউস, ক্যামেরা, স্পিকার ইত্যাদি আলাদা করে যুক্ত করতে হলেও ল্যাপটপে এসব ডিভাইস একসাথেই থাকে। মাউসের বিকল্প হিসেবে এতে একটি টাচপ্যাড থাকে যা আঙুলের স্পর্শে কাজ করে। মনিটরে একদম ওপরে একটি ওয়েবক্যাম থাকে যা দিয়ে ছবি তোলা ও ভিডিও করা যায়। এছাড়া ডেস্কটপ কম্পিউটারের সিস্টেম ইউনিটের মতো ল্যাপটপে বেশ কিছু পোর্ট থাকে যা দিয়ে প্রিন্টার, আলাদা কি-বোর্ড, মাউস ইত্যাদি চাইলে যুক্ত করা যায়।

ল্যাপটপ কম্পিউটারের সুবিধা

১. ল্যাপটপ আকারে ছোটো হওয়ায় স্কুল, খেলার মাঠ, বন্ধুর বাসা ইত্যাদি যেকোনো জায়গায় নিয়ে তুমি ব্যবহার করতে পারবে।

২. সব যন্ত্রাংশ একসাথে থাকায় আলাদা করে কোনো উপকরণ কেনার দরকার হয় না।

৩. ডেস্কটপ কম্পিউটারের চাইতে ল্যাপটপ কম্পিউটার চালাতে কম বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়।

৪. মোবাইল ফোনের মতো ব্যাটারি থাকার কারণে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ে ভাবতে হয় না।

৫. আকারে ছোটো হওয়ায় ল্যাপটপ খুব কম জায়গায় রেখেও ব্যবহার করা যায়।

ল্যাপটপ কম্পিউটারের অসুবিধা

১. কম বিদ্যুৎ খরচ করে বলে কিছু ক্ষেত্রে ল্যাপটপ কম্পিউটার ডেস্কটপ কম্পিউটারের চাইতে একটু ধীর গতির হয়।

২. ল্যাপটপে নন-ইন্টিগ্রেটেড মাদারবোর্ড থাকার কারণে প্রসেসরসহ বেশ কিছু যন্ত্রাংশ চাইলেই পরিবর্তন করা যায় না।

৩. ছোটো হওয়ায় ল্যাপটপের ভেতরের যন্ত্রাংশগুলো গরম হলে সহজে বাতাস ঢুকে ঠান্ডা হতে পারে না।

৪. বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ল্যাপটপ কম্পিউটারের দাম ডেস্কটপ কম্পিউটারের চেয়ে বেশি হয়।

৫. ডেস্কটপ কম্পিউটারের মতো ল্যাপটপ কম্পিউটার শক্তপোক্ত ও দৃঢ় হয় না। তাই অসাবধানতার কারণে খুব সহজেই এটির ক্ষতি হতে পারে।

**অনুশীলনী**

ক. প্রতিটি তথ্যের পাশে ঠিক হলে টিক (✔) আর ভুল হলে ক্রস (X) চিহ্ন দাও।

১. কম্পিউটার এবং এর আনুষঙ্গিক সকল যন্ত্রপাতিকে হার্ডওয়‍্যার বলে।

২. ওয়েবক্যাম শুধুমাত্র তারের সাহায্যেই কম্পিউটারে যুক্ত করা যায়।

৩. নন-ইন্টিগ্রেটেড মাদারবোর্ডের কোনো কিছু নষ্ট হলে পুরো মাদারবোর্ডই পরিবর্তন করতে হয়।

৪. প্যারালাল পোর্টে মোট ২৪টি ছিদ্র থাকে।

৫. রাউটার থেকে বেশি দূরত্বে ঝামেলামুক্ত ইন্টারনেট ব্যবহার করতে চাইলে রিপিটার ব্যবহার করতে হয়।

খ. বাম পাশে দেওয়া তথ্যের সাথে ডান পাশে দেওয়া ছবিগুলো মিল করো।

প্রক্রিয়াকরণ ডিভাইস

কি-বোর্ড, মাউস যুক্ত করার পোর্ট

বারকোড রিডার

স্থায়ী স্টোরেজ

ইনপুট-আউটপুট ডিভাইস

গ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও।

১. তারহীন প্রযুক্তির দুটি ইনপুট ডিভাইসের নাম লেখো।

২. বারকোড রিডার কী? এটি কোথায় বেশি ব্যবহার করা হয়?

৩. ছোটো এবং সহজে বহনযোগ্য দুটি স্টোরেজ ডিভাইসের নাম লেখো।

৪. ভিজিএ পোর্ট থেকে এইচডিএমআই পোর্ট কেন ভালো?

৫. ল্যাপটপ ব্যবহারের দুটি সুবিধা লেখো।

ঘ. ল্যাবের কাজ: শিক্ষক ল্যাবে ডেস্কটপ কম্পিউটারের সিস্টেম ইউনিটের সামনের ও পেছনের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করে প্রথমে একে একে এগুলোর ব্যপারে বর্ণনা করবেন। পরবর্তীতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে কাজটি করে দেখাবে।

অধ্যায় ৪

কি-বোর্ড ও মাউস

কি-বোর্ড (Keyboard)

কম্পিউটারে কাজের ক্ষেত্রে আমরা প্রায় সবসময়ই কিছু না কিছু ইনপুট দেই। এই ইনপুট দেওয়ার কাজে যতগুলো ডিভাইস আমরা ব্যবহার করি তার মধ্যে কি-বোর্ড সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। আগে শুধু তারযুক্ত কি-বোর্ড পাওয়া গেলেও বর্তমানে তারবিহীন কি-বোর্ডও বেশ জনপ্রিয়। কম্পিউটারের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য এতে ব্লুটুথ বা ওয়াইফাই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।

কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী কি-বোর্ডে অসংখ্য কি বা বাটন থাকে। বাজারে যেসব কি-বোর্ড পাওয়া যায় তার মধ্যে আমেরিকান স্টাইলের কি-বোর্ডে সাধারণত ১০৪টি বাটন বা কি থাকে। আলাদা আলাদা কাজ করার পাশাপাশি কিছু কি একসাথে চাপলে বিশেষ কোনো কাজ সম্পন্ন করা যায়। যেমন কোনো ওয়ার্ড ফাইলে কাজ করার পর ফাইলটি সেভকরার জন্য আমাদের বেশ কয়েকটি ধাপ পার করতে হয়। অথচ আমরা যদি Ctrl ও ১ বাটন একসাথে চাপি, তাহলে ফাইলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেভ হয়ে যাবে অথবা কোথায়, কি নামে সেভ করতে চাই সেই উইন্ডোটি আসবে।

একটি কি-বোর্ডের বাটনগুলোকে প্রধানত ৫টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

অ্যালফাবেট কি

ইংরেজি বর্ণমালার A থেকে Z পর্যন্ত ২৬টি বর্ণ লেখার জন্য এই কি-গুলো ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে যে কি-বোর্ডগুলো পাওয়া যায় সেগুলোতে ইংরেজি বর্ণের পাশাপাশি বাংলা বর্ণও উল্লেখ করা থাকে। তাই চাইলে এই কি-গুলো দিয়ে বাংলাতেও লেখা যায়।

কি-বোর্ড ও মাউস

নাম্বার কি

০ থেকে ৯ ব্যবহার করে যেকোনো সংখ্যা লেখা ও গাণিতিক হিসাব-নিকাশের কাজে এই কি-গুলো ব্যবহার করা হয়। পূর্ণাঙ্গ কি-বোর্ডে দুই সেট সংখ্যাবাচক কি থাকে- এক সেট বর্ণমালা কি-গুলোর উপরে এবং আরেক সেট থাকে কি-বোর্ডের সবার ডানে। অবশ্য ডানপাশের কি-গুলো ব্যবহার করার জন্য এদের উপরে থাকা Num Lock নামের স্পেশাল বাটনটি প্রথমে চেপে নিতে হয়।

ফাংশন কি

কি-বোর্ডে সবার উপরে F1 থেকে F12 পর্যন্ত বারোটি বাটন বা কি আছে। এগুলোকে ফাংশন কি বলে। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য এসব কি ব্যবহার করা হয়। তবে ভিন্ন ভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনে এদের কাজের বেশ কিছু পরিবর্তন থাকে। যেমন-

F1 চাপলে কম্পিউটার চালানোয় যেকোনো সাহায্য প্রয়োজন হলে পাওয়া যায়।

Ctrl + F1: মাইক্রোসফট ওয়ার্ড বা এক্সেলে এই দুইটি বাটন একসাথে চাপলে এর মেন্যু বা

রিবনটি রাখা যায় বা আড়াল করা যায়।

কোনো ফাইল সিলেক্ট থাকা অবস্থায় F2 চাপলে ফাইলটির নাম পরিবর্তন করা যায়।

আবার, মাইক্রোসফট এক্সেলে কোনো সেল সিলেক্ট থাকা অবস্থায় F2 চাপলে সেই সেলের ভেতরের লেখা পরিবর্তন করা যায়।

Ctrl + F2: মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ব্যবহারের সময় এই দুটি বাটন একসাথে চাপলে লেখাটি

প্রিন্ট করার সুবিধা সংবলিত স্ক্রিন আসে।

ব্রাউজারের মধ্যে কোনো ওয়েবসাইটে থাকা অবস্থায় ওই ওয়েবসাইটে কিছু খুঁজে পেতে

F3 বাটনে ক্লিক করতে হয়।

Alt + F4 চাপলে ব্রাউজার, ওয়ার্ড এবং এক্সেল অ্যাপ্লিকেশন একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

কোনো ফোল্ডারে বা ওয়েবসাইটে থাকা অবস্থায় F5 চাপলে তা পুনরায় চালু বা রিফ্রেশ হয়। তাছাড়া Micrsoft Word চালানোর সময় F5 চাপলে কোনো লেখা খুঁজে বের করে তা পরিবর্তন করা যায়।

মাইক্রোসফট ওয়ার্ড বা এক্সেলে একাধিক ফাইল চালু থাকলে Ctrl + Shift + F6 একসাথে

চেপে মাউসের সাহায্য ছাড়াই ফাইলগুলোর যেকোনো একটিতে ঢোকা যায়।

Microsoft Word-এ কোনো ইংরেজি শব্দের বানান এবং ব্যাকরণগত ভুল আছে কি না তা

F7 চেপে যাচাই করা যায়।

এটি চাপলে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের নির্দিষ্ট কোনো লেখা সিলেক্ট করা যায়।

মাইক্রোসফট এক্সেলে কোনো সূত্র ঠিকভাবে ব্যবহার হয়েছে কিনা তা F9 চেপে যাচাই করা যায়। মাউসের রাইট বাটন একবার ক্লিক করলে যেরকম একটি কাজের তালিকা দেখা যায়,

Shift + F10 বাটন চেপেও একই কাজ করা যায়।

Shift + F11 চাপলে মাইক্রোসফট এক্সেল ফাইলে নতুন একটি পৃষ্ঠা বা স্প্রেডশিট যুক্ত হয়।

Microsoft Word চালানোর সময় F12 চাপলে ফাইলটি কীভাবে সেভ করতে হবে তার অপশন পাওয়া যায়।

কি-বোর্ড ও মাউস

অ্যারো কি

কি-বোর্ডের কিছুটা ডানে নিচের দিকে তীরচিহ্ন বিশিষ্ট চারটি কি থাকে। এগুলো হলো উপরের তীর (↑), নিচের তীর (৬), বামের তীর (←) এবং ডানের তীর (→)। এগুলোর সাহায্যে মাউসের কার্সর উপরে-নিচে ও ডানে-বামে সরানো যায়। তাছাড়া একাধিক পৃষ্ঠাবিশিষ্ট ডকুমেন্টের যেকোনো পৃষ্ঠায় যাওয়া যায়।

স্পেশাল কি

কি-বোর্ডে আরও কিছু স্পেশাল কি থাকে যেগুলো দিয়ে আমরা বিশেষ কিছু কাজ করি। এদের কিছু কি আলাদা আলাদা কাজ করতে পারে আবার কিছু কি অন্য বাটনের সাথে একসাথে চাপলে কাজ করে। যেমন-

এস্কেপ (Esc) কি- কম্পিউটারে দেওয়া কোনো নির্দেশনা দ্রুত বাতিল করতে চাইলে এই বাটনটি চাপা হয়।

এন্টার (Enter) কি- যেকোনো ফাইল চালু করা বা ডকুমেন্টে লেখার সময় পরবর্তী লাইনে যাওয়ার জন্য এই কি ব্যবহৃত হয়।

শিফট (Shift) কি: Shift চেপে রেখে অ্যালফাবেট কি-গুলো চাপলে বড় হাতের ইংরেজি বর্ণ লেখা যায়। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের চিহ্ন লেখার জন্যও শিফট কি ব্যবহার করা হয়। যেমন- শুধু 7 চাপলে '7' লেখা আসলেও Shift + 7 চাপলে '&' লেখা আসবে।

কন্ট্রোল (Ctrl) কি: এর বিশেষ কিছু কাজ আছে। যেমন- Ctrl ও A বাটন একসাথে চাপলে কোনো লেখা বা ছবি পুরোটাই সিলেক্ট হয়ে যায়। এরপর Ctrl ও C একসাথে চাপলে ওই লেখা বা ছবিটি কপি হয়ে যায়।

স্পেসবার (Spacebar) কি: দুটি শব্দ বা বর্ণের মাঝে ফাঁকা জায়গা রাখতে এই কি ব্যবহার করা হয়। কি-বোর্ডের সবচেয়ে বড় কি এটি।

ক্যাপস লক (Caps Lock) কি- ইংরেজি বড় হাতের বর্ণ Shift বাটন ছাড়াই আনতে চাইলে শুরুতে একবার ক্যাপস লক চেপে নিলেই হয়। এরপর যেকোনো বর্ণমালা চাপলেই তা ইংরেজি বড়ো হাতের বর্ণ হয়ে আসবে।

ব্যাকস্পেস (Backspace) কি: কোনো ডকুমেন্টের একটি একটি করে বর্ণ বা লেখা মুছে ফেলতে এই কি ব্যবহার করা হয়।

ডিলিট (Delete) কি- কোনো ফাইল বা ডকুমেন্ট সাময়িকভাবে মুছতে বা Recycle Bin-এ নিতে এই বাটন ব্যবহার করা হয়। আবার Shift বাটন ধরে রেখে ডিলিট বাটন চাপলে তা পুরোপুরি মুছে ফেলা যায়। তাছাড়া কোনো টাইপ করা লেখা মুছে ফেলতেও এটি ব্যবহার করা হয়।

অল্টারনেট (Alt) কি- Alt বাটন ধরে রেখে Tab বাটন চাপলে কম্পিউটারে যতগুলো অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়‍্যার বা উইন্ডো চালু আছে সেগুলো একসাথে দেখা যায়।

কি-বোর্ড ও মাউস

মাউস

কম্পিউটার পরিচালনার জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র হলো মাউস। ইঁদুরের মতো এর আকৃতি, লেজের মতো তারের সংযোগ ও কার্সরের দ্রুত নড়াচড়ার জন্যই এর আবিষ্কারক ডগলাস এঙ্গেলবার্ট এটিকে 'মাউস' নাম দেন।

মাউস নাড়ালে মনিটরে একটি কার্সর বা পয়েন্টার (নির্দেশক) নড়ে, যা দেখতে কি, বা এর মতো হয়। এই কার্সর দিয়ে কম্পিউটারের স্ক্রিনে বিভিন্ন আইকন, ফাইল বা লেখা সিলেক্ট করে প্রয়োজনমতো ব্যবহার করা যায়।

মাউসের কার্যাবলি

• লেফট বাটন সিঙ্গেল (একবার) ক্লিক: মনিটরের যেকোনো আইকনের ওপর মাউসের কার্সর নিয়ে লেফট বাটন একবার চাপলে সেই আইকনটি সিলেক্ট হয়ে যায়।

• লেফট বাটন ডাবল (দুইবার) ক্লিক: মনিটরের যেকোনো আইকনের ওপর মাউসের কার্সরটি রেখে লেফট বাটন দ্রুত দুইবার ক্লিক করলে ঐ আইকন বা ফাইলটি ওপেন (চালু) হয়।

• রাইট (ডান) বাটন: মনিটরের যেকোনো আইকনের ওপর মাউসের কার্সর নিয়ে রাইট বাটন একবার ক্লিক করলে ঐ আইকনটি সংক্রান্ত কিছু কাজের একটি তালিকা দেখা যায়। একে ফ্লাই-আউট মেন্যু (Flyout Menu) বলে। এরপর তুমি এখান থেকে লেফট বাটনের সাহায্যে যেকোনো কাজ সিলেক্ট করতে পারবে।

কি-বোর্ড ও মাউস

স্কুল করা

মাউসের একদম মাঝে যেই চাকার মতো বাটনটি থাকে তাকে স্ক্রল হুইল বা বাটন বলে। তোমার তর্জনী আঙুল এই বাটনটির ওপর রেখে সামনে বা পেছনে সরালে দেখবে এই চাকাটি ঘুরছে। এর সাহায্যে আমরা কোনো লেখা বা পৃষ্ঠার নিচের অংশে বা উপরের অংশে যেতে পারি।

টানা ও ফেলে দেওয়া (Drag and Drop)

মনিটরের স্ক্রিনের কোনো আইকন বা ফাইল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরানোকে টানা ও ফেলে দেওয়া বা Drag and Drop বলে। ধরো, তুমি ডেস্কটপ স্ক্রিনের দিজ পিসি (This PC) আইকনটি স্ক্রিনের বাম পাশ থেকে ডান পাশে সরাবে। এর জন্য一

১. This PC আইকনের ওপর মাউসের পয়েন্টার বা কার্সর নাও।

২. এবার আইকনটির ওপর মাউসের লেফট বাটন একবার ক্লিক করে ধরে রাখো।

৩. এবার ক্লিক করে রাখা অবস্থায় মাউসটি নাড়ালে দেখবে কার্সরের সাথে সাথে This PC আইকনটিও নড়ছে।

৪. এখন স্ক্রিনে তোমার দরকার অনুযায়ী জায়গায় আইকনটি নিয়ে লেফট বাটন ছেড়ে দাও, দেখবে This PC-ও ওই জায়গায় চলে গিয়েছে।

অনুশীলনী

ক. প্রতিটি তথ্যের পাশে সত্য হলে 'স' আর মিথ্যা হলে 'মি' লেখো।

১. ব্লুটুথ বা ওয়াইফাই প্রযুক্তি হলো তারহীনভাবে দুই বা ততোধিক ডিভাইস সংযুক্ত করা।

২. F3 চাপলে কম্পিউটার চালানোর ক্ষেত্রে যেকোনো সাহায্য পাওয়া যায়।

৩. মাইক্রোসফট ওয়ার্ড চালানোর সময় F৪ বাটন চাপলে কোনো লেখা সিলেক্ট করা যায়।

৪. কোনো নির্দেশনা দ্রুত বাতিল করতে চাইলে Alt বাটন ব্যবহার করা হয়।

৫. স্ক্রল হুইল বা বাটন মাউসের সবার ডানপাশে থাকে।

খ. সঠিক শব্দ ব্যবহার করে নিচের বাক্যগুলো সম্পূর্ণ করো।

• ১০৬

F8F4

F11

Ctrl

Backspace

লেফট

১০৪

১. আমেরিকান স্টাইলের কি-বোর্ডে সাধারণত টি বাটন বা কি থাকে।

২. Alt + বাটন চাপলে যেকোনো অ্যাপ্লিকেশন একবারে বন্ধ হয়ে যায়।

৩. Shift + যোগ হয়। -বাটন চাপলে মাইক্রোসফট এক্সেল ফাইলে নতুন একটি পৃষ্ঠা বা স্প্রেডশিট

8. ও A বাটন একসঙ্গে চাপলে কোনো লেখা বা ছবি পুরোটাই সিলেক্ট হয়ে যায়।

৫. যেকোনো ফাইল বা আইকনের ওপর মাউসের কার্সরটি রেখে আইকনটি সিলেক্ট হয়। বাটন একবার ক্লিক করলে ঐ

গ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও।

১. একটি কি-বোর্ডের বাটনগুলো কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়? যেকোনো দুইটি ভাগের নাম লিখো।

২. Shift + F10 বাটন একসাথে চাপলে কী হয়?

৩. Caps Lock বাটনের কাজ কী?

৪. মাউস কে আবিষ্কার করেন?

৫. ফ্লাই-আউট মেন্যু (Flyout Menu) কী?

ঘ. ল্যাবের কাজ ১: শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে কিছু ইংরেজি শব্দ লিখতে দিবেন। শিক্ষার্থীরা নির্দেশনা অনুযায়ী তা লিখবে। লেখার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, শিক্ষার্থীরা যেসব ফাংশন ও স্পেশাল কি সম্পর্কে জেনেছে সেগুলো যেন যথাযথভাবে ব্যবহার করে।

ল্যাবের কাজ ২: মাউসের যতগুলো ব্যবহার এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে, শিক্ষক প্রথমে তা নিজে করে দেখাবেন। পরে প্রত্যেক শিক্ষার্থী সেগুলো নিজে নিজে করবে।

অধ্যায় ৫

সফটওয়‍্যার

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতেই তোমরা জেনেছ যে কম্পিউটার মূলত দুইটি অংশ মিলে তৈরি হয়। এর মধ্যে হার্ডওয়‍্যার নিয়ে আমরা এতক্ষণ জেনেছি। এই অধ্যায়ে আমরা সফটওয়্যার নিয়ে আলোচনা করব।

সফটওয়‍্যার হচ্ছে অনেকগুলো কাজের নির্দেশনার একত্রিত রূপ। সফটওয়‍্যার হার্ডওয়‍্যারের মতো ধরা বা দেখা যায় না। কিন্তু সফটওয়্যার বাদ দিয়ে কোনো মোবাইল, কম্পিউটার ইত্যাদি ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র ব্যবহার করা যায় না। সফটওয়্যার হচ্ছে যন্ত্রের প্রাণ। কম্পিউটার কোনো কাজে আসবে না যদি তা চালানোর জন্য কোনো সফটওয়্যার না থাকে। সহজ যোগ করা থেকে শুরু করে জটিল গাণিতিক সমস্যা সমাধান করা পর্যন্ত সবই সফটওয়‍্যার ছাড়া অসম্ভব।

সফটওয়‍্যার ছাড়া একটি হার্ডওয়্যার যেমন অচল, তেমনি হার্ডওয়্যার ছাড়াও সফটওয়‍্যারের কোনো মূল্য নেই। একটি কম্পিউটার যদি আগুনে পুড়ে অথবা ভেঙে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে কোনো সফটওয়্যার দিয়ে তা ঠিক করা সম্ভব না।

আমরা যেসব সফটওয়‍্যার ব্যবহার করি, তা প্রধানত দুই ধরনের হয়। যথা-

সিস্টেম সফটওয়‍্যার (System Software)

মোবাইল, কম্পিউটার ইত্যাদি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি যে ধরনের সফটওয়‍্যার দিয়ে চলে তাকে সিস্টেম সফটওয়্যার বলে। সিস্টেম সফটওয়‍্যার আমরা সরাসরি ব্যবহার করি না। কিন্তু এগুলো না থাকলে কম্পিউটারের মতো বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাবে না।

তুমি যখন কম্পিউটার চালু করো তখন কিন্তু এটি নিজে নিজেই কাজ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। এসময় সিস্টেম সফটওয়‍্যার চালু হয় এবং কম্পিউটার বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রটির সকল যন্ত্রাংশ নিজেদের মাঝে সংযোগ স্থাপন করে কাজ করার উপযোগী হয়ে ওঠে। কম্পিউটার, মোবাইল ইত্যাদি অপারেট বা চালানোর জন্য একটি সিস্টেম সফটওয়্যার দেওয়া হয় যাকে আমরা অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়‍্যার বা শুধু অপারেটিং সিস্টেম বলি। প্রযুক্তির দুনিয়ায় বেশ কিছু জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার আছে। যেমন-

সফটওয়‍্যার

ক. উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম (Windows OS): কম্পিউটার চালানোর জন্য

পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার হচ্ছে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম। ১৯৮৫ সালে আমেরিকান প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফট এটি তৈরি করে। তারপর থেকে এর অনেকগুলো ভার্সন বাজারে এসেছে। বর্তমানে উইন্ডোজের সবচেয়ে নতুন ভার্সন হচ্ছে 'উইন্ডোজ ১১'। এই সফটওয়‍্যারটি এমনভাবে তৈরি যেন একজন খুব সহজে এর সাহায্যে কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারে। অধ্যায় ৬-এ উইন্ডোজ-এর ১০ম সংস্করণ নিয়ে বিস্তারিত দেওয়া হয়েছে।

খ. ম্যাক অপারেটিং সিস্টেম (Mac OS): কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেমের

মধ্যে দ্বিতীয় জনপ্রিয় সফটওয়‍্যার হলো ম্যাক অপারেটিং সিস্টেম বা ম্যাক ওএস। ১৯৮৪ সালে আমেরিকান প্রতিষ্ঠান অ্যাপল এটি তৈরি করে। এরও অনেক ভার্সন বাজারে এসেছে, যার মধ্যে 'ম্যাক ওএস ১৫' সবচেয়ে নতুন। উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের মতো এটিও খুব সহজে ব্যবহার করা যায়।

গ. লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম (Linux OS): ১৯৯১ সালে প্রথম তৈরি হওয়া

লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমও কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের মাঝে বেশ জনপ্রিয়। এটি অন্যান্য অপারেটিং সিস্টেম থেকে একটু আলাদা, কারণ একজন ব্যবহারকারী চাইলে এই সফটওয়্যার থেকে শুধুমাত্র তার প্রয়োজনীয় ফিচার বা সুবিধাগুলো ইন্‌সটল করে নিতে পারে। এ কারণে এটি উপরিউক্ত কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম দুইটি থেকে দ্রুতগতির হয়।

ঘ. অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম (Android OS): এটি স্মার্টফোনে ব্যবহারের জন্য বিশেষ ধরনের অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়‍্যার। ২০০৮ সালে তৈরি প্রথম স্মার্টফোনে এটি ব্যবহৃত হয়। মূলত টাচস্ক্রিনের স্মার্টফোনগুলোর জন্যই এটি বানানো হয়। বর্তমান বিশ্বে সকল ধরনের অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

ঙ. আইফোন অপারেটিং সিস্টেম (iOS): এটিও স্মার্টফোনের জন্য জনপ্রিয়

একটি অপারেটিং সিস্টেম। ২০০৭ সালে আমেরিকান প্রতিষ্ঠান অ্যাপল এটি তৈরি করে। তবে এটি শুধুমাত্র অ্যাপলের তৈরি স্মার্টফোনেই ব্যবহার করা যায়।

সফটওয়্যার

অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার (Application Software)

অপারেটিং সিস্টেম আছে এমন সচল একটি কম্পিউটার বা মোবাইলে আমরা নানা কাজ করে থাকি। যেমন-গাণিতিক সমস্যার সমাধান, গেম খেলা, গান শোনা, ভিডিও এডিট করা ইত্যাদি। এসবের জন্য আমাদের যে ধরনের সফটওয়‍্যারের প্রয়োজন হয় তাকে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়‍্যার বা সংক্ষেপে অ্যাপ বলে। প্রয়োজন ভেদে আমরা বিভিন্ন রকমের অ্যাপ ব্যবহার করি। এর মধ্যে বেশ কিছু জনপ্রিয় সফটওয়্যার নিয়ে নিচে বিস্তারিত দেওয়া হলো-

ক. মাইক্রোসফট এক্সেল (Microsoft Excel): এটি কম্পিউটারে বিভিন্ন

সাধারণ গাণিতিক সমস্যার সমাধান থেকে শুরু করে জটিল হিসাব-নিকাশের কাজে ব্যবহৃত অ্যাপ্লিকেশন। কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের কাছে খুবই জনপ্রিয় সফটওয়‍্যার এটি। ১০ম অধ্যায়ে আমরা হাতে-কলমে মাইক্রোসফট এক্সেলের ব্যবহার শিখব।

খ. ভিএলসি মিডিয়া প্লেয়ার (VLC Media Player): কম্পিউটার বা মোবাইলে

গান শোনা, মুভি ও ভিডিও দেখার জন্য জনপ্রিয় একটি সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশন এটি। ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করা গান, ছবি, মুভি অথবা ক্যামেরা দিয়ে তোলা ভিডিও এই অ্যাপ্লিকেশনের সাহায্যে দেখা ও শোনা যায়। ১০ম অধ্যায়ে আমরা এই সফটওয়‍্যারটি ইন্সটল করা থেকে শুরু করে কীভাবে চালাতে হয় সে ব্যাপারে জানব।

গ. পেইন্ট (Paint): ছবি আঁকার জন্য বেশ জনপ্রিয় একটি সফটওয়‍্যার হচ্ছে

পেইন্ট। উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম আছে এমন যেকোনো কম্পিউটারে পেইন্ট সফটওয়‍্যারটি থাকে। সহজে ব্যবহারযোগ্য এই সফটওয়্যার দিয়ে ছবি আঁকা ও পুরোনো কোনো ছবি চাহিদামতো পরিবর্তন বা এডিট করা যায়।

ঘ. গুগল ক্রোম (Google Chrome): আমরা প্রয়োজনে ইন্টারনেটে বিভিন্ন

তথ্য ও ফাইল খুঁজি। এই কাজটি করার জন্য আমাদের একটি বিশেষ ধরনের সফটওয়‍্যার প্রয়োজন হয় যাকে ব্রাউজার বলে। গুগলের তৈরি ক্রোম মূলত এক ধরনের ব্রাউজার সফটওয়‍্যার। এটি বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ব্রাউজার। তথ্য খোঁজার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ফাইল, গান, ভিডিও ইত্যাদি ডাউনলোড করাসহ আরও অনেক কাজই এই সফটওয়‍্যার দিয়ে করা যায়।

৬. জুম (Zoom): এটি যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত এক ধরনের সফটওয়‍্যার। ইন্টারনেট ব্যবহার করে ভিডিও বা অডিও কলে কারো সাথে কথা বলার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। এর মাধ্যমে একাধিক মানুষের সাথে একই সময়ে যোগাযোগ করা যায়। অনলাইনে ক্লাস করা, অফিসের মিটিং করা ইত্যাদি কাজে এই সফটওয়্যারটি ব্যবহার করা হয়।

অনুশীলনী

ক. বামপাশের তথ্যের সাথে ডানপাশের উপযুক্ত ছবিগুলো মিল করো।

কম্পিউটারের সিস্টেম সফটওয়্যার

ছবি আঁকার সফটওয়্যার

স্মার্টফোনের সিস্টেম সফটওয়‍্যার

ইন্টারনেট ব্যবহারের সফটওয়্যার

ভিডিও কলে যোগাযোগের সফটওয়্যার

খ. প্রতিটি তথ্যের পাশে সঠিক হলে টিক চিহ্ন (✔) আর ভুল হলে ক্রস চিহ্ন (X) দাও।

১. সফটওয়‍্যার মূলত দুই ধরনের।

২. অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার কম্পিউটারের সকল যন্ত্রাংশের মাঝে সংযোগ স্থাপন করে।

৩. উইন্ডোজ-এর সবচেয়ে নতুন সংস্করণ হচ্ছে উইন্ডোজ ১০।

৪. আইফোন অপারেটিং সিস্টেম শুধুমাত্র অ্যাপলের তৈরি স্মার্টফোনেই ব্যবহার করা যায়।

৫. ছবি আঁকার কাজে ভিএলসি মিডিয়া প্লেয়ার ব্যবহার করা হয়।

গ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও।

১. সফটওয়্যারের দুইটি ধরনের নাম বলো।

২. উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম কারা তৈরি করেছে?

৩. কেনো লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম বাকি অপারেটিং সিস্টেমগুলোর চেয়ে আলাদা?

৪. পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়‍্যারের নাম কী?

৫. ভিএলসি মিডিয়া প্লেয়ারের কাজ কী?

ঘ. শ্রেণির কাজ: শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে দুইজন করে গ্রুপ করে দিবেন যারা নিজেদের মধ্যে সফটওয়‍্যার নিয়ে আলোচনা করবে। একজন সিস্টেম সফটওয়্যার নিয়ে এবং অন্যজন অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়‍্যার নিয়ে বলবে। পরবর্তীতে তারা তাদের টপিক অদল-বদল করে নিয়ে কাজটি করবে।

**অধ্যায় ৬**

**অপারেটিং সিস্টেম**

গান শোনা হোক আর জটিল হিসাব-নিকাশ- সব ক্ষেত্রেই কম্পিউটারকে ঠিকঠাক কাজ করার জন্য উপযুক্ত হতে হয়। আগের অধ্যায়ে তোমরা জেনেছ যে, একটি সচল কম্পিউটার বলতে শুধু কতগুলো হার্ডওয়‍্যার না, বরং এদের ব্যবহার উপযোগী করে তোলে এমন সফটওয়‍্যার থাকাকেও বোঝায়। কম্পিউটার চালানোর জন্য এই বিশেষ সফটওয়‍্যারকে অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়‍্যার বা শুধু অপারেটিং সিস্টেম বলে। কম্পিউটারে ব্যবহারের জন্য বিশ্বে বেশ কিছু জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেম আছে, যার মধ্যে মাইক্রোসফটের তৈরি উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম (Windows OS) সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার ঠিকমতো কাজ করলে তুমি খুব সহজেই কম্পিউটারে তোমার অন্যান্য কাজ অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ব্যবহার করে করতে পারবে। এই অধ্যায়ে আমরা উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের ১০ম সংস্করণ সম্পর্কে জানব।

অপারেটিং সিস্টেম

স্টার্ট মেন্যু (Start Menu): ডেস্কটপের সবচেয়ে বাম পাশে নিচে

বা স্টার্ট বাটনে ক্লিক করলে একটি মেন্যু চালু হয় যেখানে আমাদের সকল প্রয়োজনীয় সফটওয়‍্যার, অন্যান্য টুল এবং সুযোগ-সুবিধা থাকে।

সার্চ বক্স (Search Box): মেন্যুর ঠিক ডান পাশেই সার্চ বক্স থাকে। এখানে ক্লিক করে কি-বোর্ডের সাহায্যে লিখে কম্পিউটারের যেকোনো সফটওয়‍্যার, তথ্য, ফাইল, ছবি, ভিডিও ইত্যাদি খুঁজে পাওয়া যায়। তাছাড়া কম্পিউটারে নেই এমন কোনো তথ্যের খোঁজ করলে এটি সরাসরি ইন্টারনেট থেকে সে বিষয়ে আমাদের তথ্য এনে দেয়।

টাস্কবার (Taskbar): সার্চ বক্সের ডান পাশে যে আইকনটি আছে তাকে টাস্কবার বলে। কম্পিউটারে তুমি যেসকল

অ্যাপ্লিকেশন বা সফটওয়‍্যার চালাচ্ছো তার আইকনগুলো এখানে দেখা যায়। টাস্কবারের সাহায্যে তুমি সহজেই এক সফটওয়‍্যার থেকে অন্য সফটওয়‍্যারে যেতে পারবে আবার তুমি কি-বোর্ড সম্পর্কে পড়ার সময় জেনেছ যে Alt বাটন ধরে রেখে Tab বাটন চাপলেও কোন কোন অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার এবং উইন্ডো চালু আছে সেগুলো একসাথে দেখা যায়।

যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমরা বেশি ব্যবহার করি সেগুলো দ্রুত চালু করার জন্য টাস্কবারে এনে রেখে দেওয়া যায়। এজন্য-

• প্রথমে Search Box-এ তোমার প্রয়োজনীয় সফটওয়্যারটির নাম লিখে খুঁজে বের করো।

• এবার সফটওয়্যারটির নামের ওপর মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করো। দেখবে More নামের একটি অপশন আসবে।

• More-এ মাউসের লেফট বাটন ক্লিক করলে বা রাখলে দেখবে আরও কিছু অপশন আসবে। এখান থেকে

এ ক্লিক করলেই সফটওয়‍্যারটি টাস্কবারে চলে আসবে।

টাস্কবার থেকে অ্যাপ্লিকেশনটি সরিয়ে ফেলতে চাইলে-

• টাস্কবারে থাকা অ্যাপ্লিকেশনের ওপর মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করো।

• দেখবে বেশ কিছু অপশন এসেছে। সবার নিচে থাকা

এ মাউসের লেফট

বাটন ক্লিক করো। দেখবে টাস্কবার থেকে অ্যাপ্লিকেশনটি চলে গিয়েছে।

সিস্টেম ট্রে (System Tray): সিস্টেম ট্রে হচ্ছে ডেস্কটপের সবার ডানে নিচের দিকে থাকা একটি অংশ। এখানে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের নিজস্ব কিছু টুল থাকে যেগুলো আমাদের কাজের সময় দরকার হয়।

সিস্টেম ট্রেতে স্পিকারের শব্দ নিয়ন্ত্রণ, ঘড়ি ও তারিখ দেখা, কম্পিউটারের ইন্টারনেট সংযোগ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদিসহ অনেক কিছুই থাকে। এতে সবার ডানে থাকা চিহ্নটিতে ক্লিক করলে কম্পিউটারের কোনো সফটওয়‍্যার বা কাজের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা নোটিফিকেশন (Notification) এবং আরও বেশ কিছু দরকারি টুল দেখা যায়।

অপারেটিং সিস্টেম

ডেস্কটপ আইকন: হোম স্ক্রিনে সবার বামে ওপরের দিকে বেশকিছু আইকন থাকে যেগুলোর প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা কাজ আছে। এগুলো উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের নিজস্ব নিজস্ব, তাই চাইলেই এগুলো ডিলিট বা মুছে ফেলা যায় না।

দিজ পিসি (This PC): এই আইকনটি খুব সম্ভবত আমরা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি। এই আইকনটির ওপর মাউসের লেফট বাটন ডাবল ক্লিক করলে কম্পিউটারের সকল ড্রাইভ(যেখানে আমরা তথ্য বা ফাইল রাখি) দেখা যায়।

কম্পিউটারের সবগুলো ড্রাইভ একসঙ্গে দেখা যায় যে ফোল্ডারে তাকে উইন্ডোজ-এর ফাইল এক্সপ্লোরার (File Explorer) বলে। এর সাহায্যে কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কে কী কী ফাইল আছে এবং তা কোথায় আছে তা সহজে খুঁজে বের করা যায়। এটি উইন্ডোজ-এর ১৯৯৫ সালের সংস্করণে প্রথম দেওয়া হয়েছিল।

ইউজার'স ফাইল (User's Files): কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক কয়েকটি ভাগে ভাগ করে রাখা

যায় যাদের প্রত্যেকটিকে এক একটি ড্রাইভ বলে। কম্পিউটারের অনেকগুলো ড্রাইভের মধ্যে C ড্রাইভ একটি গুরুত্বপূর্ণ ড্রাইভ যেখানে সাধারণত উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম এবং অন্যান্য দরকারি সফটওয়্যার আমরা ইন্‌সটল করে থাকি। C ড্রাইভে রাখা ফাইল দেখতে হলে User's Files আইকনে মাউসের লেফট বাটন ডাবল ক্লিক করতে হয়।

কন্ট্রোল প্যানেল (Control Panel): উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের প্রয়োজনীয় সব টুল একসঙ্গে পেতে চাইলে আমরা কন্ট্রোল প্যানেল ব্যবহার করি। পাশের ছবিতে দেওয়া আইকনের ওপর মাউসের লেফট বাটন ডাবল ক্লিক করে চালু করলে একটি স্ক্রিন আসে। এখানে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের সবগুলো টুল কাজের ধরন অনুযায়ী গ্রুপ আকারে পাওয়া যায়।

নেটওয়ার্ক (Network): কি-বোর্ড, মাউস, স্পিকার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, রাউটারের মতো

অনেক প্রয়োজনীয় ইনপুট এবং আউটপুট ডিভাইস কম্পিউটারের সাথে তার বা তারছাড়া যুক্ত করা হয়। কম্পিউটারের সাথে কোন কোন ডিভাইস যুক্ত আছে তা এখানে দেখা যায়। দরকার অনুযায়ী সেগুলোর সেটিং পরিবর্তনসহ আরও নানা কাজ এখান থেকে করা যায়।

রিসাইকেল বিন (Recycle Bin): আমরা অপ্রয়োজনীয় অনেক কিছুই কম্পিউটার থেকে

ডিলিট করি বা মুছে ফেলি। আবার অনেক সময় আমরা ভুলবশত ফাইল ডিলিট করে ফেলি। এই ফাইলগুলো কিন্তু পুরোপুরি মুছে যায় না। ডিলিট করা ফাইল প্রথমে রিসাইকেল বিনে এসে জমা হয়। পরে এখান থেকে চাইলে অপ্রয়োজনীয় ফাইল পুরোপুরি মুছে ফেলা যায় অথবা প্রয়োজনীয় ফাইল পুনরুদ্ধার (Restore) করে আগের মতো কম্পিউটারে সেভ করা যায়।

অপারেটিং সিস্টেম

উইন্ডোজ-এর সেটিংস: উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের প্রয়োজনীয় সকল ফিচার এখানে দেওয়া থাকে। এই সেটিংস অপশনে গিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী অপারেটিং সিস্টেমের ফিচারগুলো ব্যবহার করা যায়। নিচে সেটিংস-এর অতি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাগুলো নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা করা হলো-

সিস্টেম (System): মনিটর, স্পিকার, হার্ড ডিস্কের ড্রাইভসহ গুরুত্বপূর্ণ ডিভাইসগুলোর প্রয়োজনীয় ফিচার ব্যবহারের সুবিধা দেওয়া হয় এখানে।

ডিভাইস (Devices): তার বা তারছাড়া যতগুলো ডিভাইস (যেমন- মাউস, প্রিন্টার ইত্যাদি) কম্পিউটারে যুক্ত হয়, সেগুলোর সেটিংসের বিভিন্ন অপশন পাওয়া যায় এখানে।

পারসোনালাইজেশন (Personalization): উইন্ডোজ-এর ডেস্কটপের ছবি, লেখার ফন্ট, আইকনের রংসহ বেশ কিছু ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহারকারীর পছন্দমতো সেটিংস পরিবর্তন করা যায় এখানে।

নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ইন্টারনেট (Network & Internet): কম্পিউটার যেসব নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করে তার প্রয়োজনীয় সেটিংস দেওয়া থাকে এখানে।

গেমিং (Gaming): কম্পিউটারে গেম খেলার সময় সহায়ক কিছু ফিচারের সেটিংস পরিবর্তনের সুযোগ থাকে এখানে।

অ্যাপ (Apps): কম্পিউটারের সকল সফটওয়্যার তালিকা আকারে আছে এখানে। এই তালিকা থেকে সহজেই যেকোনো সফটওয়্যার ব্যবহার ও প্রয়োজন অনুযায়ী তাতে পরিবর্তন করা যায়।

অ্যাকাউন্ট (Accounts): একটি কম্পিউটারে একাধিক মানুষ আলাদা আলাদাভাবে ব্যবহার করতে পারে। তাদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা আছে কম্পিউটারে। প্রত্যেক ব্যবহারকারীর ভিন্ন ভিন্ন তথ্য যেন নিরাপদে সংরক্ষিত থাকে তার বেশ কিছু সুবিধা থাকে এখানে।

সার্চ (Search): ডেস্কটপের সার্চ বক্স আর এই সার্চের কাজ একই।

টাইম অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ (Time & Language): কম্পিউটারের সময়, তারিখ, ভাষা ইত্যাদির সেটিংস পাওয়া যায় এখানে।

অনুশীলনী

ক. প্রতিটি তথ্যের পাশে সত্য হলে 'স' আর মিথ্যা হলে 'মি' লেখো।

১. কম্পিউটারে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

২. সার্চ বক্সের ঠিক ডানপাশে যে জায়গাটুকু আছে তাকে সিস্টেম ট্রে বলে।

৩. Pin 30 tarkber ফিচারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশন টাস্কবারে সবসময়ের জন্য রেখে দেওয়া যায়।

8. This PC-তে সবগুলো টুল তাদের কাজের ধরন অনুযায়ী গ্রুপ আকারে পাওয়া যায়।

৫. সেটিংস-এর অ্যাপসে কম্পিউটারের সকল সফটওয়‍্যার ও তাদের ব্যাপারে বেশ কিছু ফিচার থাকে

খ. সঠিক শব্দ ব্যবহার করে নিচের বাক্যগুলো সম্পূর্ণ করো।

• প্রাইভেসি

স্টার্ট

বামে

সিস্টেমস

রিসাইকেল বিন

গেমিং ডানে

ড্রাইভ

১.-এ ক্লিক করলে একটি মেন্যু চালু হয় যাকে মেন্যু বলে।

২. সিস্টেম ট্রে ডেস্কটপের সবার নিচের দিকে থাকে।

৩. কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কের প্রত্যেকটি ভাগকে এক একটি বলে।

৪. কম্পিউটারের মনিটর, স্পিকার, হার্ড ডিস্কের ড্রাইভসহ গুরুত্বপূর্ণ ডিভাইসগুলোর প্রয়োজনীয় ফিচার -এ থাকে।

৫. Restore-এর মাধ্যমে --এ থাকা ফাইল পুনরায় কম্পিউটারে সেভ করা যায়।

গ. সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

১. অপারেটিং সিস্টেম কী?

২. Unpin from taskbar বলতে কী বোঝায়?

৩. আইকনটির ব্যাপারে তুমি কী জানো?

৪. ফাইল এক্সপ্লোরার কি? এটি কবে প্রথম তৈরি করা হয়?

৫. উইন্ডোজ-এর ডেস্কটপের ছবি সেটিংস-এর কোথায় গিয়ে পরিবর্তন করা যায়? এতে আর কী সুবিধা আছে?

ঘ. ল্যাবের কাজ: কম্পিউটার ল্যাবে গিয়ে শিক্ষকের সহায়তায় শিক্ষার্থীরা এই অধ্যায়ে বর্ণিত উইন্ডোজ অপারেটিং

সিস্টেমের প্রতিটি ফিচার চিনবে এবং ব্যবহার করে দেখাবে।

**অধ্যায় ৭ মাল্টিমিডিয়া, ইন্টারনেট, ব্রাউজার ও ই-মেইল**

**মাল্টিমিডিয়া (Multimedia)**

মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য আমরা নানা মাধ্যম ব্যবহার করি। কেউ কথা বলে, কেউ গান গায়, আবার কেউ চিঠি লেখে। এগুলোর প্রত্যেকটি ভাব প্রকাশের এক-একটি মাধ্যম। একের অধিক মাধ্যম যখন একত্রিত হয়, তখন মনের ভাব আরও ভালোভাবে প্রকাশ পায়। তুমি কাউকে চিঠি লিখে যতটা মনের ভাব প্রকাশ করতে পার, চিঠি লেখার সাথে একটি ছবি পাঠলে আরও ভালোভাবে ভাব প্রকাশ করতে পারবে। অর্থাৎ, একটি একক ভাব প্রকাশের মাধ্যমের চেয়ে একাধিক উপায়ে ভাব প্রকাশের মাধ্যম বেশি কার্যকরী। একেই মাল্টিমিডিয়া বলে।

মাল্টি (Multi) শব্দের অর্থ একের অধিক, আর মিডিয়া (Media) শব্দের অর্থ মাধ্যম। একটিমাত্র মাধ্যমের সাহায্যে যদি আমরা একাধিক উপায়ে (ছবি, শব্দ, লেখা, ভিডিও) মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি, তবে তাকে মাল্টিমিডিয়া বলে। যেসব সফটওয়‍্যার এই কাজ করতে পারে সেসব সফটওয়‍্যারকে আমরা মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার বলে। যেমন- ভিএলসি (VLC) মিডিয়া প্লেয়ার বা মাইক্রোসফটের পাওয়ার পয়েন্ট (Powerpoint) এক-একটি মাল্টিমিডিয়া সফটওয়‍্যার।

মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার

শিক্ষা ক্ষেত্রে: শিশুদের জন্য শিক্ষণীয় ভিডিও তৈরি, ক্লাসে প্রজেক্টরের সাহায্যে পাঠদান, অনলাইনে ভিডিও কলের মাধ্যমে ক্লাস করা।

• বিজ্ঞাপন তৈরিতে: টিভিতে দেওয়া ভিডিও বিজ্ঞাপন, রাস্তার পাশে থাকা ডিজিটাল বিলবোর্ড।

• ব্যবসা-বাণিজ্যে: মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে কোনো পণ্যের বেচা-কেনা, নতুন পণ্য সম্পর্কে প্রচারণা চালানো।

• বিনোদনে: মজার কার্টুন, ভিডিও বা চলচ্চিত্র দেখা, মোবাইল অথবা কম্পিউটারে গেম খেলা।

• চিকিৎসা ক্ষেত্রে: রোগ নির্ণয় ও তার প্রতিকার করা, ওষুধ শিল্পে নিয়মিত গবেষণা করা।

• প্রকাশনা শিল্পে: কাগজ আকারে বই তৈরির পাশাপাশি কম্পিউটার বা মোবাইলে পড়ার উপযোগী পিডিএফ বই বানানো, শিক্ষণীয় বিভিন্ন ভিডিও তৈরি করা।

মাল্টিমিডিয়া, ইন্টারনেট, ব্রাউজার ও ই-মেইল

ইন্টারনেট (Internet)

যোগাযোগের জন্য প্রয়োজন একে অপরের সাথে যুক্ত থাকা। যুক্ত থাকার এ ব্যবস্থাকে নেটওয়ার্ক বলে। বড় পরিসরে অর্থাৎ, বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের যে কারো সাথে যোগাযোগ করতে হলে যে নেটওয়ার্ক ব্যবহার করি তাকে ইন্টারনেট বলে।

ইন্টারনেটের ধরন

ইন্টারনেটের বেশ কিছু ধরন আছে। সবচেয়ে জনপ্রিয় ধরনগুলো হল-

• ক্যাবল ইন্টারনেট: এক্ষেত্রে তারের সাহায্যে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়। এটি সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়ে থাকে।

• তারহীন বা ওয়‍্যারলেস ইন্টারনেট: এক্ষেত্রে ইন্টারনেট সেবা

দাতা এবং গ্রহীতার মাঝে কোনো তারের সংযোগ থাকে না। ইন্টারনেটের মূল সংযোগ থেকে তার এনে তা রাউটারের সাথে সংযোগ দিতে হয়। এরপর রাউটার সেই ইন্টারনেট তারছাড়া আমাদেরকে তারহীনভাবে ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়।

• সেলুলার ইন্টারনেট: মোবাইল ফোনে আমরা যে সিম ব্যবহার করি, সে সিমের মাধ্যমে পাওয়া ইন্টারনেটই হচ্ছে সেলুলার ইন্টারনেট। দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং যেখানো জায়গায় ব্যবহার করা যায় বলে এটি বেশ জনপ্রিয়। এটিও একটি তারহীন প্রযুক্তি।

• স্যাটেলাইট ইন্টারনেট: আমাদের পৃথিবীর চারপাশে যে কৃত্রিম স্যাটেলাইট ঘুরে বেরায়, তা থেকে প্রাপ্ত ইন্টারনেট সেবাই হচ্ছে স্যাটেলাইট ইন্টারনেট। এটি খুবই দ্রুতগতিসম্পন্ন কিন্তু ব্যয়বহুল।

ইন্টারনেটের কার্যপদ্ধতি

• প্রথমেই প্রয়োজন ইন্টারনেট ব্যবহারের উপযোগী একটি ডিভাইস, যেমন- ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, স্মার্টফোন, ইত্যাদি।

• এবার ডিভাইসের সঙ্গে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া প্রয়োজন। সুযোগ থাকলে আমরা ক্যাবল অথবা ওয়‍্যারলেস ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারি। চাইলে মোবাইল নেটওয়ার্ক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সেলুলার ইন্টারনেটও নিতে পারি।

• ইন্টারনেট সংযোগ নেওয়ার পর একটি ব্রাউজার সফটওয়‍্যার ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় তথ্য খোঁজা শুরু করতে পারি। একবার ইন্টারনেট ব্যবহার করা মানে তুমি বিশ্বের কোটি কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সাথে যুক্ত হয়ে গেলে।

ইন্টারনেটের সুবিধা

ইন্টারনেটের অনেক সুবিধা আছে। যেমন- গান শোনা বা ভিডিও দেখা, জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজনে অনলাইনে ডাক্তার দেখানো, ভিডিও কলের মাধ্যমে কারো সাথে কথা বলা, কোনো বিষয় বা তথ্য সম্পর্কে ইন্টারনেটে খোঁজ করা, অনলাইনে কোনো পণ্য কেনা-বেচা করা ইত্যাদি।

মাল্টিমিডিয়া, ইন্টারনেট, ব্রাউজার ও ই-মেইল

ব্রাউজার (Browser)

ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য আমাদের বিশেষ ধরনের সফটওয়্যার প্রয়োজন। এই সফটওয়‍্যারকে ব্রাউজার বলে। ইংরেজি 'ব্রাউজ' (Browse) শব্দের অর্থ হলো দেখা বা তাকানো। আমরা কোনো কিছু খোঁজার জন্য যেমন আশপাশে তাকাই, তেমনি ব্রাউজার ব্যবহার করেও প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজতে পারি। তথ্য খোঁজার পাশাপাশি কোনো ওয়েবসাইটে প্রবেশ করা, ওয়েবসাইট থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী কোনো ফাইল ডাউনলোড করা, কাউকে অনলাইনে চিঠি বা ফাইল পাঠানোসহ আরও নানা কাজে আমরা ব্রাউজার সফটওয়‍্যার ব্যবহার করি। তাছাড়া সেটিং পরিবর্তন করে এবং অতিরিক্ত ফিচার যোগ করে এসব সফটওয়‍্যারের সক্ষমতা বাড়ানো যায়।

পৃথিবীতে যেসব ব্রাউজার সফটওয়‍্যার বেশি ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে জনপ্রিয় কিছু ইন্টারনেট ব্রাউজার হলো-

১. ক্রোম (Chrome): বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ব্রাউজার সফটওয়‍্যার এটি। আমেরিকান

প্রতিষ্ঠান গুগল ২০০৮ সালে এটি তৈরি করে। প্রায় সকল অপারেটিং সিস্টেমে এই সফটওয়্যারটি চালানো যায়। কম্পিউটারের পাশাপাশি মোবাইল, ট্যাবলেট ইত্যাদি ডিভাইসেও এই ব্রাউজারটি ব্যবহার করা যায়। প্রতিবারই নতুন নতুন ভার্সন বের করার মাধ্যমে গুগল তাদের সফটওয়‍্যারটি আরও বেশি কার্যকরী এবং নিরাপদ করে যাচ্ছে।

২. সাফারি (Safari): আমেরিকান প্রতিষ্ঠান অ্যাপলের তৈরি এই সফটওয়‍্যারটি ব্যবহারের

দিক দিয়ে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে আছে। এটি ২০০৩ সালে প্রথম তৈরি করা হয়। মূলত অ্যাপলের তৈরি কম্পিউটার, স্মার্টফোন, ট্যাবলেটে ব্যবহারের জন্যই এই সফটওয়‍্যারটি বানানো হয়েছিল। এটি বেশ দ্রুতগতির এবং নিরাপদ। গুগলের মতো অ্যাপলও প্রতিবার নতুন ভার্সন বের করার মাধ্যমে তাদের সফটওয়‍্যারটি আরও উন্নত করে যাচ্ছে।

৩. এজ (Edge): এজ হচ্ছে আমেরিকান প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফটের তৈরি একটি ব্রাউজার

সফটওয়‍্যার। এটি ২০১৫ সালে তৈরি করা হয়। যেহেতু এটি মাইক্রোসফটের তৈরি, তাই মাইক্রোসফট তাদের উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের সাথেই এই সফটওয়‍্যারটি দিয়ে দেয়। বাকি সব ব্রাউজারের মতো এটিও দ্রুতগতিসম্পন্ন। এতে প্রয়োজনে অতিরিক্ত ফিচার যুক্ত করা যায়, ফলে একজন ব্যবহারকারীর কাছে সফটওয়‍্যারটির গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়।

৪. ফায়ারফক্স (Firefox): আমেরিকান প্রতিষ্ঠান মজিলা এই ব্রাউজারটি তৈরি করে। ২০০৪

সালে বাজারে আসা এই ব্রাউজারটিও বেশ পরিচিত। এটি একটি ওপেন সোর্স সফটওয়্যার, অর্থাৎ মজিলা এই সফটওয়্যারটি বানানোর সকল উপকরণ সবার দেখার জন্য উন্মুক্ত রেখেছে। ব্যবহারকারীর তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে এই সফটওয়‍্যারটি জনপ্রিয়।

মাল্টিমিডিয়া, ইন্টারনেট, ব্রাউজার ও ই-মেইল

ই-মেইল (E-mail)

ই-মেইল বা ইলেক্ট্রনিক মেইল হচ্ছে এক ধরনের ডিজিটাল চিঠি। আগে মানুষ নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য চিঠি আদান-প্রদান করত। ইন্টারনেট আবিষ্কারের পর মানুষ এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের যে কারো সাথে মুহূর্তের মধ্যেই যোগাযোগ করতে শুরু করে। রে টমলিনসন (Ray Tomlinson) নামের একজন আমেরিকান কম্পিউটার প্রোগ্রামার ১৯৭১ সালে প্রথম এই পদ্ধতিটি তৈরি করেন যার মাধ্যমে একই নেটওয়ার্কে যুক্ত দুইজন কম্পিউটার ব্যবহারকারী নিজেদের মধ্যে বার্তা আদান-প্রদান করতে পারত। আগে ই-মেইলে শুধু কথা বা লেখা পাঠানোর ব্যবস্থা থাকলেও এখন তাতে ছবি, ভিডিওসহ নানা ফাইল যুক্ত করে পাঠানো যায়। ই-মেইল পাঠানোর জন্য প্রথমেই তোমার একটি ই-মেইল অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে। ই-মেইল প্রযুক্তির ব্যবহারের জন্য বয়স কমপক্ষে ১৩ বছর হতে হয়।

ই-মেইলে বার্তা পাঠানোর পদ্ধতি

প্রথমে gmail.com-এ গিয়ে নিজের ই-মেইল আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ-ইন বা প্রবেশ করো। তারপর স্ক্রিনের বামে উপরে থাকা Compose বাটনে ক্লিক করো। তাহলে নিচে দেওয়া স্ক্রিনের মতো একটি উইন্ডো আসবে। এবার-

• To নির্দেশিত জায়গায় যাকে ই-মেইল পাঠানো হবে তার ই-মেইল অ্যাড্রেস লিখতে হবে। পাশে দেওয়া Cc (Carbon Copy)-তে ক্লিক করলে আরও মানুষের ই-মেইল অ্যাড্রেস লেখার অপশন আসবে।

• এবার তার নিচে Subject অংশে কী বিষয়ে ই-মেইলটি লেখা হচ্ছে তা দিতে হবে। এখানে ই-মেইলের মূল বিষয়টি ছোট একটি বাক্যে লিখতে হবে। চাইলে এই জায়গাটি ফাঁকাও রাখা যায়।

• এখন মাঝের বড় যে ফাঁকা সাদা জায়গা আছে এখানে মূলত লেখার কাজটি করতে হয়।

• নিচে নীল রঙয়ের Send বাটনের পাশে অনেকগুলো অপশন ধারাবাহিকভাবে আছে। এর কোনোটি দিয়ে ছবি যুক্ত করা যায়, কোনোটি দিয়ে অন্য ফাইল বা ভিডিও যুক্ত করা যায় অথবা কোনোটি দিয়ে লেখার ফন্ট ও রঙসহ নানা ধরনের পরিবর্তন করা যায়। তোমার প্রয়োজন অনুযায়ী এই অপশনগুলো ব্যবহার করবে।

• এবার লেখার সাথে ফাইল বা ছবি যুক্ত করবে। এরপর নীল রঙের Send বাটনে ক্লিক করলেই ই-মেইলটি যাকে পাঠানো হচ্ছে তার কাছে চলে যাবে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✔) চিহ্ন দাও।

১. মিডিয়া (Media) শব্দের অর্থ কী?

ক. বন্ধুত্ব

খ. যোগাযোগ

গ. মাধ্যম

ঘ. খুঁজে বের করা

২. নিচের কোন ক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করা হয় না?

ক. দৌড়ানোর সময়

খ. চিকিৎসায়

গ. বিনোদনে

ঘ. শিক্ষায়

৩. মোবাইল সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো যেই ইন্টারনেট সেবা দেয় তাকে কী বলে?

ক. ক্যাবল ইন্টারনেট

খ. ওয়‍্যারলেস ইন্টারনেট

গ. স্যাটেলাইট ইন্টারনেট

ঘ. সেলুলার ইন্টারনেট

৪. ক্রোম ইন্টারনেট ব্রাউজার সফটওয়্যার প্রথম কত সালে তৈরি করা হয়?

ক. ২০০৭

খ. ২০০৮

গ. ২০০৯

ঘ. ২০১০

৫. ই-মেইল ব্যবহারের জন্য সর্বনিম্ন বয়স কত?

ক. ১৩ খ. ১৪ গ. ১৫ ঘ. ১৬

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও।

১. শিক্ষা ক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহারের লেখো।

২. কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান আমাদের ইন্টারনেট সুবিধা পেতে সাহায্য করে?

৩. ওপেন সোর্স সফটওয়‍্যার বলতে কী বোঝ?

৪ . ই-মেইল পদ্ধতি সর্বপ্রথম কে এবং কত সালে আবিষ্কার করেন?

৫. ই-মেইল লেখার সময় Cc অংশটি কী কাজে লাগে?

গ. ল্যাবের কাজ: একটি ই-মেইল কীভাবে লিখতে হয় শিক্ষক প্রথমে তা ধাপে ধাপে করে দেখাবেন। এরপর প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে এ কাজটি নিজে নিজে করবে।

**অধ্যায় ৮**

**অ্যালগরিদম ও যুক্তিসঙ্গত চিন্তাধারা**

অ্যালগরিদম হচ্ছে অনেকগুলো ছোট ছোট কাজের তালিকা যেগুলো ধারাবাহিকভাবে করলে একটি বড় কাজ সম্পন্ন হয়। অ্যালগরিদম না মানলে কোনো কাজই যথাযথভাবে করা যায় না অথবা ভুল ফলাফল আসবে। তবে অনেক সময় একটি কাজ একাধিকভাবে চাইলে করা যায়। কম্পিউটারও তেমনি কাজের ধারাবাহিকতা মেনে অনেক কঠিন কাজও সম্পন্ন করতে পারে। এখানে আমরা অ্যালগরিদম মেনে একটি সমস্যার সমাধান করবো।

সমস্যা ১: ধারাবাহিকভাবে নিচের গানিতিক সমস্যাটির সমাধান করো-

৭+[{৪৫/৯+৩) × {(১২-৭) × ২-৫)-১]/১৩

সমাধান

১. প্রথমে প্রথম বন্ধনীর কাজ করতে হবে। এখানে বন্ধনীর ভেতর ১২-৭ আছে, যার উত্তর আসে ৫।

২. এবার দ্বিতীয় বন্ধনীর কাজ করতে হবে। এখানে দুটি দ্বিতীয় বন্ধনী আছে, যার মধ্যে ভাগের কাজ আগে করতে হবে। তাহলে ৪৫/৯-এর উত্তর আসবে ৫।

৩. এবার আরেক দ্বিতীয় বন্ধনীর ভেতরে থাকা গুণের কাজ হবে। তাহলে ৫ × ২-এর উত্তর আসবে ১০।

৪. এবার দুটি দ্বিতীয় বন্ধনীর মধ্যে যোগের কাজ আগে হবে। তাহলে ৫ + ৩-এর উত্তর হচ্ছে ৮।

৫. এবার আরেক দ্বিতীয় বন্ধনীর ভেতরের বিয়োগের কাজ হবে। ফলে ১০-৫ করলে উত্তর আসবে ৫।

৬. এবার তৃতীয় বন্ধনীর ভেতরের গুণ ও বিয়োগের মধ্যে আগে গুণের কাজ হবে। ফলে ৮ × ৫-এর উত্তর আসবে ৪০।

৭. এবার তৃতীয় বন্ধনীর ভেতরের বিয়োগের কাজ হবে। ফলে ৪০-১ করলে উত্তর আসে ৩৯।

৮. এবার যোগ ও ভাগের মধ্যে আগে ভাগের কাজ হবে। ৩৯/১৩-এর উত্তর আসে ৩।

৯. সবশেষে থাকা দুটি সংখ্যা যোগ করলে চূড়ান্ত ফলাফল আসবে। অর্থাৎ চূড়ান্ত উত্তর আসবে ৭+৩ = ১০।

অ্যালগরিদম ও যুক্তিসঙ্গত চিন্তাধারা

যুক্তিসংগত চিন্তাধারা

বাইরে অনেক ঠান্ডা, হাত-পা জমে যায়। এ অবস্থায় তুমি বাইরে গেলে কি পাতলা জামা পড়বে না ভারী জামা পরবে? উত্তর হচ্ছে ভারী জামা পরতে হবে। আবার ধরো, তুমি খেলতে গিয়ে পড়ে আঘাত পেয়েছ। এ অবস্থায় তুমি কি খেলা চালিয়ে যাবে নাকি দ্রুত ডাক্তারের কাছে যাবে? অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যাবে।

আমাদের জীবনে এরকম অনেক সিদ্ধান্ত যুক্তি দিয়ে চিন্তা করে নিতে হয়। কখন কোন মুহূর্তে কোনো কাজ করা উচিত তা আমরা সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণ করেই ঠিক করি। একেই যুক্তিসংগত চিন্তা করা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া বলে।

এখানে আমাদের প্রতিদিনের জীবনসংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় এবং উপাদান দেওয়া হলো। প্রতিটি তালিকা থেকে যেটি বেমানান বা বাকি বিষয়গুলোর সাথে যায় না সেগুলো চিহ্নিত করো। কেন সেটি চিহ্নিত করলে সে ব্যাপারে তোমার সহপাঠীদের যুক্তি দাও।

অ্যালগরিদম ও যুক্তিসঙ্গত চিন্তাধারা

নিচের তথ্যগুলোর মধ্যে যেগুলো সঠিক সেগুলোর পাশে টিক চিহ্ন (√) আর ভুল হলে ক্রস চিহ্ন (X) দাও।

১. আমরা শীতকালে ছাতা ব্যবহার করি।

২. একটি কাচের গ্লাস একটি কাগজের পৃষ্ঠার চেয়েও ভারী।

৩. পাখি পানিতে সাঁতার কাটে।

৪. কম্পিউটার চালানোর জন্য কোনো বিদ্যুৎ বা ব্যাটারির দরকার হয় না।

৫. সব ফুলের রং সাদা হয়।

৬. বিমান আকাশে ওড়ে।

৭. ক্রিকেট খেলতে ব্যাট-বলের কোনো প্রয়োজন হয় না।

৮. বিড়াল সহজে পোষ মানানো যায়।

৯. একটি আমগাছের চেয়ে একটি তালগাছ লম্বা হয়।

১০. খাবার ফ্রিজে রাখলে গরম থাকে।

অ্যালগরিদম ও যুক্তিসঙ্গত চিন্তাধারা

বামের ছবির সাথে ডানের উপযুক্ত ছবির মিল করো।

তালিকার ফাঁকা স্থানে উপযুক্ত ছবিটি আঁকো বা সংখ্যাটি লেখো।

অধ্যায় ৯ কম্পিউটারের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপদ ব্যবহার

স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য আমরা কী করি? নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার খাই, সময়মতো ঘুমাই, গোসল করি, নিয়মিত খেলাধুলা করি। অর্থাৎ সুস্বাস্থ্যের জন্য খুবই জরুরি এমন কিছু কাজ আমাদের নিয়ম মেনে করতে হয়। ঠিক তেমনি যদি কম্পিউটারের যন্ত্রপাতি আমরা ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ না করি, তাহলে অল্প দিনেই তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কম্পিউটারের যেহেতু হার্ডওয়‍্যার এবং সফটওয়‍্যার দুটি অংশ আছে, তাই দুটিরই আলাদা করে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

হার্ডওয়‍্যারের রক্ষণাবেক্ষণ

নিচে কম্পিউটারের হার্ডওয়‍্যারের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে আলোচনা করা হল-

ধূলাবালি থেকে রক্ষার উপায়

• নিয়মিত কম্পিউটার এবং এর অন্যান্য যন্ত্রাংশ শুকনো কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করব। সম্ভব হলে প্রতি ২-৩ মাস পর পর কম্পিউটারে পারদর্শী এরকম কারো সাহায্য নিয়ে পুরো কম্পিউটারটি খুলে পরিষ্কার করব।

• ব্যবহার শেষে কম্পিউটার ঢেকে রাখব।

• ধোঁয়া তৈরি হয় (যেমন- রান্নাঘর) এমন স্থানের আশপাশে কম্পিউটার রাখব না।

• গুঁড়াজাতীয় খাবার বা কোনো জিনিস কম্পিউটারের আশপাশে রাখব না।

• প্রয়োজন না পড়লে কম্পিউটার যে রুমে আছে, সে রুমের দরজা-জানালা বন্ধ রাখব।

পানিজাতীয় জিনিস থেকে রক্ষার উপায়

• কম্পিউটারের আশপাশে পানি বা তরলজাতীয় কিছু রাখব না।

• হাত ভেজা থাকা অবস্থায় কম্পিউটার বা এর কোনো যন্ত্রাংশ ধরব না।

• কখনোই ভেজা কাপড় দিয়ে কম্পিউটারের কোনো যন্ত্রাংশ পরিষ্কার করব না।

• স্যাঁতসেঁতে বা আর্দ্র জায়গায় কম্পিউটার রাখব না। রুম পরিষ্কার ও শুকনো রাখব।

•

কম্পিউটার যদি জানালার পাশে থাকে তাহলে বাইরে বৃষ্টি হলে জানালা বন্ধ রাখব।

• ল্যাপটপ বা ট্যাবলেট ব্যাগে করে বাইরে বহন করার সময় এমন ব্যাগ ব্যবহার করব যাতে সহজে পানি না ঢুকে। এতে বৃষ্টি হলে ব্যাগে পানি ঢুকে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা কম থাকে। পাশাপাশি অবশ্যই সাথে ছাতা রাখব।

কম্পিউটারের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপদ ব্যবহার

ভুলে যদি পানি বা তরলজাতীয় কিছু কম্পিউটারে ঢুকে পড়ে তাহলে-

সাথে সাথে কম্পিউটার বন্ধ করতে হবে। এরপর বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। শুকনো কাপড় দিয়ে এর বাইরের এবং ভেতরের অংশ মুছতে হবে। সম্পূর্ণ শুকিয়ে আসলে কম্পিউটার চালু করে দেখতে হবে যে ঠিকমতো তা চলছে কি না। না চললে বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিতে হবে।

অতিরিক্ত তাপমাত্রা থেকে রক্ষার উপায়

তুলনামূলক ঠান্ডা এবং শুকনো জায়গায় কম্পিউটার রাখব।

রুমের ভেতরে যেন পর্যাপ্ত বাতাস আসা-যাওয়া করতে পারে তা নিশ্চিত করব।

কম্পিউটারের ভেতরে যে কুলিং ফ্যান আছে তা ঠিকমতো কাজ করছে কি না নিশ্চিত হব।

সম্ভব হলে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রুমে কম্পিউটার রাখব।

অতিরিক্ত তাপমাত্রা তৈরি করে (যেমন- রান্নাঘর) এমন রুমের পাশে কম্পিউটার রাখব না।

অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

• কম্পিউটারের আশপাশে খেলাধুলা করব না।

• বাইরে ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সময় কম্পিউটারের সকল তার বৈদ্যুতিক সংযোগ থেকে খুলে রাখব।

কম্পিউটারের আশপাশে চুম্বকজাতীয় কিছু রাখব না।

• ব্যবহার শেষে সঠিক উপায়ে কম্পিউটারের বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করব।

সফটওয়্যারের রক্ষণাবেক্ষণ

• প্রয়োজন ছাড়া সফটওয়্যার রাখলে কম্পিউটারের গতি কমে যায়। তাই অপ্রয়োজনীয় সফটওয়্যার রাখব না।

• সময়মতো অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়‍্যার আপডেট করব।

কম্পিউটারের প্রসেসর এবং র‍্যাম ঠিকমতো কাজ করছে কি না তা নিয়মিত যাচাই করব।

• ক্ষতিকর কোনো সফটওয়‍্যার থেকে বাঁচার জন্য অ্যান্টিভাইরাস নামক বিশেষ সফটওয়‍্যার ব্যবহার করব।

• সফটওয়্যার এবং গুরুত্বপূর্ণ ফাইলের কপি অন্য কোনো কম্পিউটারে বা হার্ড ডিস্কে রাখব যেন কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেলেও প্রয়োজনীয় ফাইলগুলো পাওয়া যায়।

কম্পিউটারের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপদ ব্যবহার

কম্পিউটারে আসক্তি

প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় ধরে যদি কোনো কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকা হয় তাহলে দৈনন্দিন অন্যান্য কাজে বিঘ্ন ঘটে।

এছাড়া শারীরিক বা মানসিকভাবে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। একে আসক্তি বলে। কোনো কিছুতে আসক্তি তৈরি হওয়া ভালো না। এতে করে একদিকে যেমন সময়ের অপচয় হয়, অপরদিকে শারীরিক, মানসিকসহ নানা সমস্যা দেখা দেয়।

নিয়ম না মেনে এবং দীর্ঘ সময় কম্পিউটার ব্যবহার করলে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো দেখা দিতে পারে-

শারীরিক সমস্যা

• চোখ: দীর্ঘ সময় কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে কাজ করলে চোখ দিয়ে পানি পড়া, ব্যথা হওয়া, চুলকানো, ঝাপসা দেখাসহ নানা সমস্যা হতে পারে।

• মাথা: মনিটরের স্ক্রিন চোখ বরাবর না থাকলে মাথা সোজা রেখে ব্যবহার করা যায় না। ফলে অনেকক্ষণ টানা ব্যবহারের পর মাথা ব্যথা হতে পারে।

• হাত: দীর্ঘসময় এবং নিয়ম না মেনে কি-বোর্ড ব্যবহারের ফলে হাতের আঙুল ও কবজিতে ব্যথা হতে পারে। জোরে কি-বোর্ডের বাটনগুলো চাপলে একদিকে যেমন হাতের আঙুলে ব্যথা হয়, অপরদিকে কি-বোর্ডও দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অনেকেই ঠিকমতো মাউস ধরে না বা মাউস-প্যাড ব্যবহার করে না। এতে হাতের আঙুল এবং কবজিতে ব্যথা হয়।

• ঘাড়: অনেকক্ষণ একটানা কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে কাজ করলে ঘাড় ঠিকমতো নাড়ানো হয় না। এতে করে ঘাড়ে প্রচন্ড ব্যথা হতে পারে। তাছাড়া চেয়ারে ঠিকমতো না বসে কম্পিউটার ব্যবহার করলেও একই সমস্যা হতে পারে।

• পিঠ ও কোমর: সঠিকভাবে চেয়ারে না বসলে এবং একটানা বসে কম্পিউটার ব্যবহার করলে পিঠ ও কোমরে ব্যথা হতে পারে।

• স্থূলতা: প্রতিদিন যদি অনেকক্ষণ বসে কম্পিউটারে কাজ করা হয়, তাহলে শরীরের ওজন অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যেতে পারে। তাই নিয়মিত ব্যায়াম, খেলাধুলা ইত্যাদি শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করা উচিত।

মানসিক সমস্যা

অতিরিক্ত কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে অনেকেই পরবর্তীতে সবকিছুতে মানসিকভাবে চাপ অনুভব করে। তাছাড়া অল্পতেই রেগে যাওয়া, কোনো কাজ ঠিকমতো মন দিয়ে করতে না পারাসহ বেশকিছু সমস্যাও দেখা যায়।

অন্যান্য সমস্যা

স্ক্রিনের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার ফলে অনেকেই রাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারে না। তাছাড়া পরিবার ও বন্ধুদের সময় না দিতে পেরে পরবর্তীতে একাকিত্ব ও বিষণ্ণতায় ভোগে।

কম্পিউটারের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপদ ব্যবহার

নিয়ম মেনে কম্পিউটার ব্যবহার

আমরা যদি নিয়ম মেনে কম্পিউটার ব্যবহার করি, তাহলে কম্পিউটারের প্রতি আসক্তি তৈরি হবে না। তাছাড়া যেসব স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির কথা ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, সেগুলো থেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে। সঠিকভাবে কম্পিউটার ব্যবহারের নিয়মগুলো নিচে দেওয়া হলো-

বসার স্থান বা চেয়ার এবং টেবিল নির্বাচন: আমাদের

সবার বয়স, উচ্চতা যেমন এক না, তেমনি কম্পিউটার ব্যবহারের নিয়মও সবার জন্য এক না। তাই যে কম্পিউটার ব্যবহার করবে তার কথা মাথায় রেখেই চেয়ার এবং টেবিল নির্বাচন করতে হবে। আবার চেয়ারে বসা মানে শুধু কম্পিউটার বরাবর বসে থাকাই না, কাজের প্রয়োজনে আমাদের একটু নড়াচড়া করতে হয়। চেয়ার ও টেবিলের আশপাশে নড়াচড়ার জন্য যেন যথেষ্ট জায়গা থাকে তা খেয়াল রাখতে হবে

মনিটরের উজ্জ্বলতা: যখন আমরা দিনের বেলা কাজ

করি তখন বাইরের আলোর কারণে মনিটরের স্ক্রিন ভালোমতো দেখতে কষ্ট হয়। তাই মনিটরের উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে নিতে হয়। আবার রাতের বেলা বাইরের আলো থাকে না বলে মনিটরের উজ্জ্বলতা অল্পতেই অনেক বেশি মনে হয়। তাই রাতের বেলা কাজের সময় মনিটরের উজ্জ্বলতা কমানো উচিত। এতে করে চোখের ওপর চাপ কম পরবে।

মনিটর থেকে চোখের দূরত্ব: কোনো কিছু কাছ থেকে দেখতে হলে আমাদের চোখের মাংশপেশীগুলো বেশি সচল হতে হয়। আবার উজ্জ্বল কোনো কিছু দেখতে গেলে চোখের মাংসপেশীগুলো খুব দ্রুত নড়াচড়া করে। মনিটরের স্ক্রিনে উজ্জ্বল এবং এতে চলা জিনিস কাছ থেকে দেখতে হয় বলে একটানা অনেকক্ষণ ব্যবহারের ফলে আমাদের চোখ ব্যথা করতে পারে। ডাক্তার এবং স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, কম্পিউটারের মনিটর এবং আমাদের চোখের মাঝে সবসময় ২০-৩০ ইঞ্চি (৫০-৭৬ সেন্টিমিটার) দূরত্ব বজায় রাখা উচিত। মনিটরের আকার যদি অনেক বড় হয় তাহলে এই দূরত্ব আরও বাড়াতে হবে।

আলো নির্বাচন: কোনো উজ্জ্বল আলোর (সূর্য, ঘরের বাতি) বিপরীত দিকে যদি মনিটর থাকে, তাহলে মনিটরের উজ্জ্বলতা বাড়ালেও ঠিকমতো এর স্ক্রিন দেখা যায় না। তাই মনিটর রুমের এমন জায়গায় রাখতে হবে যেন বাইরের আলো মনিটরের ওপর সরাসরি না পড়ে।

যথাযথ বিশ্রাম: অনেকক্ষণ একটানা কম্পিউটারে কাজ করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাই প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট

সময়ের বেশি কম্পিউটার ব্যবহার না করাই ভালো। আবার বয়সভেদে কম্পিউটার ব্যবহারের সময়ও আলাদা। আমেরিকার একটি জরিপে দেখা গেছে যে, ৮-১২ বছর বয়সী বাচ্চারা দিনে ৪-৬ ঘণ্টা টিভি, কম্পিউটার বা মোবাইলের স্ক্রিনে তাকিয়ে সময় ব্যয় করে। এটি শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ওএসএফ হেলথকেয়ারের (OSF Healthcare) মতে, ৫-১৭ বছর বয়সী একটি শিশুর জন্য দিনে ২ ঘণ্টার বেশি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে কোনো কাজ করা উচিত না। ইংল্যান্ডের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি তথ্য অনুযায়ী, পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষের প্রতি ১ ঘণ্টা কম্পিউটারে কাজের পর কমপক্ষে ১০ মিনিটের বিরতি নেওয়া উচিত।

কম্পিউটারের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপদ ব্যবহার

শিশুদের ইন্টারনেটের নিরাপদ ব্যবহার

কম্পিউটার আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সহজ ও দ্রুতগতির করেছে। কম্পিউটার ব্যবহারের সাথে ইন্টারনেট ব্যবহারের মাত্রাও বেড়েছে। এইসব প্রযুক্তি আমাদের জন্য আশীর্বাদ হলেও যদি ঠিকমতো বা সতর্কতার সাথে তা ব্যবহার করা না হয়, তাহলে বড় ধরনের বিপদ হতে পারে। শিশুরা কীভাবে নিরাপদে ইন্টারনেট ব্যবহার করবে, সে বিষয়ে নিচে আলোচনা করা হলো-

• সাহায্য চাওয়া: কম্পিউটার ব্যবহারের সময় কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে অভিভাবকের সাহায্য নিবে।

• ব্যক্তিগত তথ্য গোপন রাখা: নিজের ছবি, ঠিকানা, কম্পিউটারের পাসওয়ার্ড ইত্যাদি ব্যক্তিগত তথ্য অনলাইনে কেউ চাইলে কখনো দিবে না।

• অপরিচিত লোকের থেকে সাবধানতা: আগে থেকে চেনা নেই এমন কারো সাথে কথা বলা উচিত না। অপরিচিত ব্যক্তি কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চাইলে দিবে না।

• নিরাপদ ওয়েবসাইট ব্যবহার: ইন্টারনেটে থাকা সব ওয়েবসাইট আমাদের জন্য উপকারী না। তাই কোনো ওয়েবসাইটে ঢোকার আগে বা কোনো তথ্য ব্যবহারের আগে মা-বাবা অথবা অভিজ্ঞ কারো সাথে পরামর্শ করে জেনে নাও এটি তোমার জন্য কতটুকু উপকারী।

• পাসওয়ার্ড গোপন রাখা: তোমার ই-মেইলের পাসওয়ার্ড কখনো কাউকে দিবে না।

অনলাইনে সম্মান বজায় রাখা: ইন্টারনেট ব্যবহার করতে গিয়ে অনেক সময় আমরা ভুলবশত কারো সাথে খারাপ আচরণ করি, না বুঝে কষ্ট দেই। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে আমাদের কখনোই শিষ্টাচার বহির্ভূত আচরণ করা উচিত না।

ডাউনলোডের ব্যাপারে সাবধানতা: আমরা আমাদের প্রয়োজনে

ব্রাউজার ব্যবহার করে অনেক কিছু ডাউনলোড করি। তবে কখনো কোনো ওয়েবসাইট বিশ্বাসযোগ্য না হলে তা থেকে কোনো ফাইল ডাউনলোড করা উচিত না। এ ব্যাপারে সবসময় বয়সে বড়দের থেকে সাহায্য নিবে।

• লুকিয়ে কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট না ব্যবহার করা:

কম্পিউটারের মনিটর এমন জায়গায় রেখে আমরা কাজ করবো যেন আমাদের মা-বাবা অথবা অভিভাবকদের কেউ সবসময় দেখতে পায় যে আমরা কী কাজ করছি। এতে করে অসাবধানতাবশত আমরা যদি কোনো ভুল করি তাহলে তারা ঠিক করে দিবেন।

অনুশীলনী

ক. প্রতিটি তথ্যের পাশে ঠিক হলে টিক চিহ্ন (✔) আর ভুল হলে ব্রুস চিহ্ন (X) দাও।

১. ধোঁয়া তৈরি হয় (যেমন- রান্নাঘর) এমন স্থানের আশপাশে কম্পিউটার রাখা ঠিক না।

২. ভেজা কাপড় দিয়ে কম্পিউটারের কোনো যন্ত্রাংশ পরিষ্কার করলে অসুবিধা হয় না।

৩. সময়মতো কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার হালনাগাদ বা আপডেট করা উচিত

8. দিনের বেলা মনিটরের উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে নিতে হয়।

৫. নিজের ছবি, জন্ম তারিখসহ ব্যক্তিগত তথ্য অনলাইনে কেউ চাইলে কখনো দেওয়া উচিত না।

৬. কোনো উজ্জ্বল আলোর (সূর্য, ঘরের বাতি) মুখোমুখি মনিটর থাকলেও তাতে কাজ করতে কোনো অসুবিধা হয় না।

৭. মনিটর আকারে বড় হলেও তার থেকে বসার দূরত্ব পরিবর্তন করতে হয় না।

৮. ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় অন্য মানুষের সাথে বেয়াদবি করা যায়

৯. কম্পিউটারের অতিরিক্ত ব্যবহার আমাদের অলসতা বাড়িয়ে দেয়।

১০. প্রতি ১ ঘণ্টা কম্পিউটারে কাজের পর কমপক্ষে ১০ মিনিটের বিশ্রাম নেওয়া উচিত।

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও।

১. ভুলে যদি পানিজাতীয় কিছু কম্পিউটারে ঢুকে পড়ে তাহলে প্রথমে কী করতে হবে?

২. অতিরিক্ত তাপমাত্রা থেকে কম্পিউটার রক্ষার দুটি উপায় লেখো।

৩. একটি কম্পিউটারের ফাইল অন্য কোনো হার্ড ডিস্ক বা কম্পিউটারে কপি করে রাখা কেন ভালো?

৪. কম্পিউটারে আসক্তি বলতে কী বোঝ?

৫. কম্পিউটারে আসক্তির ফলে চোখে কী কী সমস্যা হতে পারে?

৬. আমাদের চোখের থেকে কম্পিউটারের মনিটরের দূরত্ব কতটুকু হওয়া উচিত?

৭. তোমার বয়সী একটি বাচ্চার দিনে কতক্ষণের বেশি ডিসপ্লেতে তাকিয়ে কাজ করা উচিত না?

৮. কম্পিউটার ধুলাবালি থেকে রক্ষণাবেক্ষণের দুটি উপায় লেখো।

৯. কী কী তথ্য আমরা ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় অপরিচিত কাউকে দিব না?

১০. লুকিয়ে বা বাবা-মায়ের থেকে আড়ালে কম্পিউটার ব্যবহার করা কেন ঠিক না?

গ. ল্যাবের কাজ: শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার ল্যাবে নিয়ে গিয়ে একটি কম্পিউটারের সামনে বসে কীভাবে কাজ করতে হয় তা প্রথমে শিক্ষক নিজে করে দেখাবেন। পরবর্তীতে শিক্ষকের সহায়তায় একে একে সকল শিক্ষার্থী তা করবে।

অধ্যায় ১০

হাতে-কলমে কম্পিউটার শিক্ষা

মাইক্রোসফট এক্সেল (Microsoft Excel)

কম্পিউটার আবিষ্কারের প্রধান উদ্দেশ্য আমাদের হিসাব-নিকাশে সহায়তা করা। এই কাজটি করার জন্য বর্তমানে বেশ কিছু অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়‍্যার পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে মাইক্রোসফট এক্সেল (Microsoft Excel), গুগল শিট (Google Sheets), অ্যাপল নাম্বার (Apple Numbers) এবং লিবরা অফিস (Libre Office) বেশ জনপ্রিয়। এ অধ্যায়ে আমরা মাইক্রোসফটের তৈরি এক্সেল-এর প্রাথমিক পর্যায়ের ব্যবহার শিখবো।

মাইক্রোসফট এক্সেল চালু করা

১. প্রথমে Start() বাটনে ক্লিক করো। এখানে A থেকে Z পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে কম্পিউটারের সবগুলো প্রোগ্রাম বা অ্যাপ্লিকেশন দেখতে পাবে। এবার মাউসের স্ক্রল বাটনের সাহায্যে প্রোগ্রামের তালিকার নিচের দিকে নামতে থাকো যতক্ষণ না Microsoft Office 2013 নামের একটি ফোল্ডার পাওয়া যায়। এই ফোল্ডারে ক্লিক করো। (কিছু কিছু কম্পিউটারে Microsoft Office-এর ২০১৬, ২০১৯ বা অন্য কোনো সংস্করণ থাকতে পারে। বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য বাদে এদের সবার কাজ একই।)

২. এখন অনেকগুলো নতুন প্রোগ্রাম দেখতে পাবে। এর মধ্য থেকে Excel 2013-এ মাউসের লেফট বাটন একবার ক্লিক করো।

৩. তোমার কম্পিউটারে Microsoft Excel চালু হয়ে গেল। এবার যে স্ক্রিনটি দেখতে পাবে তাতে থাকা Blank workbook-এ মাউসের লেফট বাটন একবার ক্লিক করো। এভাবে তোমার কম্পিউটারে গাণিতিক হিসাব-নিকাশ করার জন্য Microsoft Excel-এর একটি স্প্রেডশিট চালু হয়ে গেল। ছোট ছোট ঘর করা যে ফাঁকা পৃষ্ঠায় আমরা তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করে গাণিতিক হিসাব-নিকাশ, ফলাফল তৈরি এবং প্রাপ্ত ফলাফলকে বিশ্লেষণ করি তাকে স্প্রেডশিট বলে।

হাতে-কলমে কম্পিউটার শিক্ষা

মাইক্রোসফট এক্সেলের স্প্রেডশিট পরিচিতি

এক্সেল বাটন (Excel Button): স্ক্রিনে সবার বামে উপরের দিকে মাইক্রোসফট এক্সেলের আইকনবিশিষ্ট একটি

বাটন আছে। এতে ক্লিক করলে বর্তমানে যে ডকুমেন্টে কাজ হচ্ছে তা বন্ধ করা, ডকুমেন্টটি মিনিমাইজ (Minimize) করে টাস্কবারে আইকন আকারে নেওয়া, ম্যাক্সিমাইজ (Maximize) করে মনিটরের পুরো স্ক্রিনে দেখানো ইত্যাদি অপশন পাওয়া যায়।

কুইক অ্যাকসেস টুলবার (Quick Access Toolbar): নিজের প্রয়োজনীয় কিছু ফিচার দ্রুত ব্যবহারের জন্য এক্সেল

বাটনের পাশে এনে রেখে দেওয়া যায় বা দরকার না পরলে বাদ দেওয়া যায়। এই অংশের সবার ডানে তীরচিহ্নবিশিষ্ট একটি অপশন আছে যাতে ক্লিক করলে প্রয়োজনীয় সকল ফিচারের একটি তালিকা আসে। এখান থেকে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী ফিচার সিলেক্ট করলে তা টুলবারে চলে আসে।

টাইটেল বার (Title Bar): স্ক্রিনের সবার ওপরে থাকা অংশ যাতে স্প্রেডশিটে কাজ করা হচ্ছে তার নাম দেখা যায়।

রিবন (Ribbon): টাইটেল বারের নিচে থাকা এই অংশে FILE, HOME, INSERT, PAGE LAYOUT, FORMULAS-সহ বেশ কিছু মেন্যু থাকে। তাই একে অনেকে মেন্যু বার-ও বলে। প্রতিটি মেন্যুতে প্রয়োজনীয় একাধিক টুল পাওয়া যায়।

স্ক্রল বার (Scroll Bar): স্ক্রিনের সবার ডানে দণ্ডায়মান একটি বারের মতো অংশ আছে। এর সাহায্যে একটি স্প্রেডশিটের ওপর থেকে নিচে যাওয়া যায়। আবার নিচের দিকে আরেকটি সমান্তরাল বার আছে। এতে ক্লিক করে স্প্রেডশিটের ডানে-বামে যাওয়া যায়।

হাতে-কলমে কম্পিউটার শিক্ষা

ওয়ার্কশিট (Worksheet): রিবনের নিচের ছোট ছোট ঘর করা ফাঁকা জায়গাকে ওয়ার্কশিট বা শুধু শিট বলে। হিসাব-নিকাশের সব কাজ এই জায়গাতেই হয়। এখানে তথ্য ইনপুট বা লেখার জন্য অনেক ছোট চারকোনা বক্সের মতো জায়গা থাকে। এদেরকে সেল (Cell) বলে।

কলাম (Column): ওয়ার্কশিটে উপরের দিকে A, B, C... নামে মোট ১৬,৩৮৪টি কলাম বা স্তম্ভ থাকে। এর যেকোনো একটি কলামের নামের ওপর ক্লিক করলে তার নিচের সবগুলো সেল সিলেক্ট হয়ে যায়।

রো (Row): ওয়ার্কশিটে সবার বামে ১, ২, ৩... সংখ্যায় ওপর থেকে নিচের দিকে মোট ১,০৪৮,৫৭৬টি আনুভূমিক সারি থাকে। এদেরকে রো বা সারি বলে। কোনো একটি রো এর সংখ্যার ওপর ক্লিক করলে ঐ রো বরাবর সকল সেল সিলেক্ট হয়ে যায়।

সেল রেফারেন্স (Cell Reference): একটি সেলের পরিচয় দুইটি তথ্য দিয়ে তৈরি হয়- প্রথমে কলামের নাম এবং

পরে রো-এর সংখ্যা দিয়ে। অর্থাৎ, কোনো সেলের রেফারেন্স যদি C5 হয় তাহলে বুঝতে হবে সেলটি C কলামে এবং ৫ নম্বর রোতে আছে। C কলাম এবং ৫ নম্বর রো একটি আরেকটিকে যে সেলে ছেদ করে বা মিলিত হয় সেটিই C5 নামের সেল।

নেম বক্স (Name Box): কোনো সেলে ক্লিক করলে তার রেফারেন্স এই বাক্সে পাওয়া যায়। তাছাড়া এই বাক্সে যদি কোনো সেলের রেফারেন্স লিখে এন্টার বাটন চাপা হয়, তাহলে সরাসরি সেই সেলে যাওয়া যায়।

অ্যাক্টিভ সেল (Active Cell): কোনো সেলে যদি আমরা কাজ করি, তাহলে সেলের রো সংখ্যা এবং কলামের নামের জায়গাটি একটু ধূসর হয়ে যায়। অর্থাৎ, কোন সেলে কাজ হচ্ছে তা বোঝা যায়।

ফর্মুলা বার (Formula Bar): রিবনের নিচে থাকা এই অংশে আমরা সকল গাণিতিক সূত্র লিখি বা কোন সূত্রটি ব্যবহার হচ্ছে তা দেখতে পাই। এক্সেলে যেকোনো গাণিতিক সূত্রের আগে '=' বা সমান চিহ্ন বসাতে হয়। অর্থাৎ, ফর্মুলা বারে কোনো সূত্র লিখতে হলে আগে '' লিখে নিয়ে তারপর সূত্রটি বসাতে হয়।

তাছাড়া কোনো সেলের ওপর ক্লিক করলে ওই সেলে কি আছে (তথ্য বা সূত্র ব্যবহারের ফলাফল) তাও ফর্মুলা বারে দেখা যায়।

শিট ট্যাব (Sheet Tab): একটি এক্সেল ফাইলে একাধিক শিট তৈরি করা যায়। কতগুলো শিট আছে এবং কোন শিটে কাজ হচ্ছে তা এই ট্যাবে দেখা যায়। তাছাড়া এখানে শিটের পাশে থাকা-এ ক্লিক করে নতুন শিট যুক্ত করা যায়।

স্ট্যাটাস বার (Status Bar): সবার নিচে সবুজ রঙের এই বারে এক্সেল শিটটি দেখানোর নানা উপায় পাওয়া যায়।

জুম স্লাইডার (Zoom Slider): স্ট্যাটাস বারের ডানে থকে এটি। ডকুমেন্টের কোনো অংশ বড় বা ছোট করে দেখার কাজে এই ফিচারটি কাজে লাগে।

ক্লোজ বাটন (Close Button): শিটটি যদি সেভ করা থাকে, তাহলে এই বাটনে ক্লিক করলে ডকুমেন্টটি সরাসরি বন্ধ হয়ে যায়।

হাতে-কলমে কম্পিউটার শিক্ষা

রিবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ফিচারের পরিচিতি

হাতে-কলমে কম্পিউটার শিক্ষা

কোনো সেলে তথ্য ইনপুট দেওয়া

ধরা যাক, তুমি B5 সেলে 101 সংখ্যাটি লিখবে।

এজন্য-

১. প্রথমে B5 সেলটি ক্লিক করো।

২. এবার কি-বোর্ডের সাহায্যে 101 লিখে এন্টার বাটন চাপো। দেখবে B5 সেলে 101 লেখাটি দেখা যাচ্ছে।

সেলের তথ্য এডিট করা অথবা মুছে ফেলা

ধরা যাক, তুমি B5-এ থাকা 101-এর বদলে 110 লিখতে চাচ্ছো। এজন্য-

১. প্রথমে B5-এ একবার ক্লিক করো।

২. এবার Backspace বা Delete বাটন চাপো।

তাহলে তথ্যটি ডিলিট হলো বা মুছে গেল। এখন নাম্বার কি-এর সাহায্যে 110 লিখে এন্টার বাটন চাপো। দেখবে সেলে 101 লেখাটি চলে এসেছে।

সাধারণ সূত্রের ব্যবহার

ধরা যাক, তুমি 4+ 4X4 গানিতিক সমস্যাটির সমাধান এক্সেল ব্যবহার করে করতে চাও। এজন্য-

১. শুরুতে যেকোনো একটি ফাঁকা সেল (ধরে নেওয়া যাক D5) সিলেক্ট করে '=' বা সমান চিহ্ন চাপো। এতে করে D5 সেলটি সূত্র ব্যবহারের জন্য তৈরি হলো।

২. এবার তুমি 4+44 ইনপুট হিসেবে দাও।

এক্ষেত্রে অ্যাস্টেরিক (\*) চিহ্নটি গুণের কাজ করবে। ভাগের ক্ষেত্রে আমরা ফরওয়ার্ড ফ্ল্যাশ (/) ব্যবহার করি।

৩. তুমি Enter বাটন চাপো। দেখবে D5 সেলে উত্তর হিসেবে 20 লেখা এসেছে।

তুমি যে সেলে 4+4 \* 4 লিখেছিলে তার উত্তর 20 সে সেলেই পেলে। এই সেলের ওপর ক্লিক করলে ফর্মুলা বারে গাণিতিক বাক্যটি দেখতে পাবে। যদি ভুল করে সংখ্যার বদলে কোনো চিহ্ন বা বর্ণ টাইপ করো, তাহলে যে সেলে কাজ করেছ, সেখানে '#NAME?' লেখাটি আসবে।

হাতে-কলমে কম্পিউটার শিক্ষা

এক্সেলে দেওয়া ফাংশনের ব্যবহার

একাধিক সংখ্যার যোগ, বিয়োগ বা সূত্র ব্যবহার করে গাণিতিক সমস্যার সমাধান হাতে লিখে করা বেশ সময়সাপেক্ষ ও কষ্টকর। দ্রুত ও নির্ভুল সমাধান পেতে আমরা এক্সেলে দেওয়া সূত্রগুলো ব্যবহার করতে পারি।

ধরা যাক, এক্সেলের একটি শিটে একই কলামে পরপর 10, 20, 50 এবং 100 আছে। এগুলো তুমি ফাংশন ব্যবহার করে যোগ করবে। এজন্য-

১. প্রথমে 100 এর নিচের ফাঁকা স্থানে '=' দিয়ে SUM লিখি এবং Tab বাটন চাপো। এতে করে যোগের সূত্রটি সিলেক্ট হয়ে গেল।

২. এবার মাউসের লেফট বাটন 10 লেখা সেলের ওপর ক্লিক করো এবং না ছেড়ে দিয়ে 100 লেখা সেলের ওপর পর্যন্ত কার্সর এনে ছেড়ে দাও। এতে চারটি সংখ্যা যোগের জন্য সিলেক্ট হয়ে গেল।

৩. এবার Enter বাটন চাপো। এতে করে চারটি সংখ্যাই যোগ হয়ে গেল। ফলাফল হিসেবে 100-এর নিচের সেলে 180 দেখা যাবে।

তুমি চাইলে সরাসরি যোগের জন্য Autosum-এ ক্লিক করতে পারো। এজন্য-

১. 100 এর নিচে ফাঁকা সেলে মাউসের লেফট বাটন একবার ক্লিক করে সিলেক্ট করে নাও।

২. এবার রিবনে ডানপাশে থাকা ∑ AutoSum-এ ক্লিক করো। এতে চারটি সংখ্যা যোগের জন্য সিলেক্ট হয়ে গেল। এবার Enter বাটন চাপলেই যোগের ফল হিসেবে 180 দেখতে পাবে।

সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে ছোট সংখ্যা খুঁজে বের করা

একাধিক সংখ্যার মধ্যে থেকে সবচেয়ে বড় সংখ্যা বের করতে হলে আমরা Max সূত্র ব্যবহার করি। ধরা যাক, তুমি একটু আগে যোগের জন্য ব্যবহার করা চারটি সংখ্যার মধ্যে কোনটি বড় তা বের করতে চাও। এজন্য-

১. প্রথমে 100-এর নিচের ফাঁকা স্থানে '=' দিয়ে Max লিখি এবং Tab বাটন চাপো। এতে করে বড় সংখ্যা বের করার সূত্রটি সিলেক্ট হয়ে গেলো।

২. এবার 10-100 পর্যন্ত আগের মতো সিলেক্ট করো।

৩. এবার Enter বাটন চাপো। এতে করে উত্তরে সবচেয়ে বড় সংখ্যা হিসেবে 100 দেখাবে।

হাতে-কলমে কম্পিউটার শিক্ষা

সবচেয়ে ছোট সংখ্যা বের করার ক্ষেত্রে-

১. প্রথমে 100-এর নিচের ফাঁকা স্থানে '=' দিয়ে Min লেখো এবং Tab বাটন চাপো। এতে করে ছোট সংখ্যা বের করার সূত্রটি সিলেক্ট হয়ে গেলো।

২. এবার আগের মতোই 10 থেকে 100 পর্যন্ত সিলেক্ট করো এবং Enter বাটন চাপো। এতে করে উত্তরে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা হিসেবে 10 দেখাবে।

চার্ট তৈরি করা

চার্ট হচ্ছে তথ্য বা উপাত্তকে ছবির সাহায্যে উপস্থাপন করা। তথ্য বা উপাত্ত পড়ে বোঝার চেয়ে ছবির মাধ্যমে উপস্থাপন করলে অর্থ সহজেই বোঝা যায়। তবে হাতে ছবি আঁকা বেশ সময়সাপেক্ষ। এক্সেলে সহজেই বিভিন্ন রকমের সহজবোধ্য চার্ট তৈরি করা যায়। নিচে চার্ট তৈরির পদ্ধতি দেখানো হলো-

প্রশ্ন: শায়ান, আনিকা ও ইশতিয়াকের কাছে যথাক্রমে ৭৫০, ১৫০০ এবং ৬১০ টাকা আছে। তাদের কাছে মোট কত টাকা আছে? তাদের প্রত্যেকের টাকার পরিমাণ পাই চার্টের মাধ্যমে দেখাও।

সমাধান

১. প্রথমে তথ্যের একটি তালিকা তৈরি করতে হবে। তালিকার একটি কলামে নাম এবং অন্য কলামে টাকার পরিমাণ থাকবে। যেকোনো একটি সেল ক্লিক করে তাতে Shayan লিখে Enter চাপো। এরপর তার নিচে Anika এবং তার নিচে Ishtiak লেখো।

২. এবার Shayan লেখা সেলের ডান পাশের সেলে 750 লিখে Enter বাটন চাপো। তাহলে শায়ানের টাকার পরিমাণ লেখো হয়ে গেলো। একইভাবে Anika লেখা সেলের পাশে 1500 এবং Ishtiak লেখা সেলের পাশে 610 লেখো। এতে করে প্রত্যেকের নামের পাশে তাদের টাকার পরিমাণ লেখা হয়ে গেলো।

হাতে-কলমে কম্পিউটার শিক্ষা

৩. এবার 610 লেখা সেলের নিচের সেল সিলেক্ট করে তাতে প্রথমে '=' চাপো। এরপর SUM লিখে Tab বাটন চাপো। এতে করে যোগের ফর্মুলা সিলেক্ট করা হয়ে গেল।

৪. এবার মাউসের লেফট বাটন 750 লেখা সেলের ওপর ক্লিক করো এবং না ছেড়ে দিয়ে 610 লেখা সেল পর্যন্ত কার্সর এনে ছেড়ে দাও। এতে করে ৩টি সংখ্যাই যোগের জন্য সিলেক্ট হয়ে গেল।

৫. এবার Enter বাটন চাপলে তিনজনের মোট টাকার পরিমাণ ২৮৬০ টাকা বের হল। তুমি এখন ফর্মুলা বারে =SUM(C3:C5) দেখতে পাবে। অর্থাৎ C3 থেকে C5 পর্যন্ত সেলে থাকা সংখ্যা যোগ করা হয়েছে। এখন আমরা চার্ট তৈরি করব।

৬. প্রথমে Shayan লেখা সেলের ওপর ক্লিক করো এবং না ছেড়ে দিয়ে 610 লেখা সেলের ওপর পর্যন্ত কার্সর এনে ছেড়ে দাও। এতে করে নাম ও টাকার পরিমাণসহ পুরো তালিকাটি সিলেক্ট হয়ে গেল।

৭. এবার রিবনে থাকা INSERT ফিচারে ক্লিক করো। এরপর Charts ট্যাবে নানা ধরনের চার্ট বানানোর অপশন আসবে। পাই চার্ট বানানোর জন্য আইকনে ক্লিক করো। এতে করে পাই চার্টের নানা ধরন নিয়ে আরেকটি মেন্যু আসবে। এখান থেকে 2-D Pie-এ থাকা প্রথম ডিজাইনে ক্লিক করো।

হাতে-কলমে কম্পিউটার শিক্ষা

৮. এবার দেখবে পাশের ছবিটির মতো একটি চার্ট এসেছে। পুরো বৃত্তটি তাদের তিনজনের মোট টাকা (২৮৬০ টাকা) নির্দেশ করে। এছাড়া নীল অংশটি শায়ানের, কমলা অংশটি আনিকার এবং ধূসর অংশটি ইশতিয়াকের টাকার পরিমাণ বোঝাচ্ছে। যেহেতু আনিকার টাকা সবচেয়ে বেশি, তাই বৃত্তের কমলা অংশটি সবচেয়ে বড় জায়গা নিয়ে আছে।

এক্সেলের ফাইল সেভ করা

যেই ফাইলে আমরা কাজ করলাম তা সেভ করতে চাইলে-

১. Ctrl + S চাপো। এতে করে দ্রুত ফাইলটি সেভ করতে পারবে।

২. এবার যেই স্ক্রিন আসবে তাতে সবার নিচে থাকা Browse-এ ক্লিক করো।

৩. এবার কী নামে, কোথায় ফাইলটি সেভ করতে চাও তার অপশন আসবে। রাখার জায়গা হিসেবে প্রথমে New Volume (E:)-এ ক্লিক করো। তারপর File Name-এর পাশে 'My Excel Work' লেখো।

৪. এখন সবার শেষে থাকা Save বাটনে ক্লিক করো। তাহলে এক্সেল ফাইলটি সেভ হয়ে যাবে।

হাতে-কলমে কম্পিউটার শিক্ষা

সফটওয়্যার ইনসটল করা

যেকোনো লেখা পড়ার জন্য Foxit Reader একটি প্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশন। নিচে Windows অপারেটিং সিস্টেম সংবলিত একটি কম্পিউটারে Foxit Reader কীভাবে ইন্সটল করতে হয় তা ধাপে ধাপে দেখানো হলো-

ধাপ ১

প্রথমে তোমার কম্পিউটারে থাকা Foxit PDF Reader-এর ইন্সটলেশন ফাইল (যার নামের শেষে .exe লেখা আছে) তা বের করো।

ধাপ ২

এবার ফাইলটির ওপর মাউসের লেফট বাটন দ্রুত ডাবল ক্লিক করলে ইন্‌সটলেশন শুরু হবে। প্রথমে ভাষা নির্বাচন করতে হবে। যদি English থাকে তাহলে Next-এ ক্লিক করো।

ধাপ ৩

তারপর পাশে দেওয়া ছবিটি আসবে। আবার Next-এ ক্লিক করো।

হাতে-কলমে কম্পিউটার শিক্ষা

ধাপ ৪

এখন পাশের ছবিটির মতো একটি স্ক্রিন আসবে। 'I accept the agreement' -এর বাম পাশে থাকা গোল জায়গায় একবার ক্লিক করে Next-এ ক্লিক করো।

ধাপ ৫

এখন কম্পিউটারের কোন জায়গায় ফাইলটি ইনসটল করতে চাও তা আসবে। এটা সাধারণত পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় না। তাই Next-এ ক্লিক করো।

ধাপ ৬

এখন ফাইলটি সংশ্লিষ্ট আরও কিছু অতিরিক্ত আইটেম ইন্‌সটল করার স্ক্রিন আসবে। Next-এ ক্লিক করো।

হাতে-কলমে কম্পিউটার শিক্ষা

ধাপ ৭

এবার নিচের ছবিটির মতো সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত আরও কিছু আইটেম ইন্সটল করার স্ক্রিন আসবে।

Next-এ ক্লিক করো।

ধাপ ৮

ক্ষতিকর কোনো PDF বা ফাইল চালু করলে যেন কম্পিউটারের কোনো ক্ষতি না হয় তাই নিচের ছবিটির মতো একটি স্ক্রিন আসবে। Enable Safe Reading Mode-এর পাশে দেওয়া বাক্সে একবার ক্লিক করে Next-এ ক্লিক করো।

হাতে-কলমে কম্পিউটার শিক্ষা

ধাপ ৯

এখন ফাইলটি ইন্সটল হওয়া শুরু হবে এবং নিচে দেওয়া ছবির মতো সবুজ বার দেখা যাবে। বার-টি সম্পূর্ণ সবুজ হলেই Foxit PDF Reader ইন্সটল সম্পন্ন হবে।

ধাপ ১০

ইন্সটলেশন শেষ হলে নিচের ছবিটির মতো স্ক্রিনে লেখা আসবে। এবার Finish চেপে ইন্সটলেশন সম্পন্ন করো।

হাতে-কলমে কম্পিউটার শিক্ষা

সফটওয়‍্যার আন-ইন্সটল করা

নিচে Windows অপারেটিং সিস্টেম সংবলিত একটি কম্পিউটারে Foxit Reader কীভাবে আন-ইন্সটল করতে হয় তা ধাপে ধাপে দেখানো হল-

ধাপ ১

প্রথমে ডেস্কটপের আইকনে ক্লিক করে Control Panel লিখলে একটি প্রোগ্রাম দেখাবে। এখন তার ওপর মাউসের লেফট বাটন ক্লিক করো অথবা কি-বোর্ডের Enter কি চাপো।

ধাপ ২

এখন যে স্ক্রিন আসবে তাতে Programs-এর নিচে থাকা Uninstall a program-এ ক্লিক করো।

ধাপ ৩

পাশে দেওয়া ছবির মতো একটি তালিকা আসবে। এখান থেকে Foxit Reader-এ মাউসের লেফট বাটন ডাবল ক্লিক করো।

হাতে-কলমে কম্পিউটার শিক্ষা

ধাপ ৪

পাশে দেওয়া ছবির মতো একটি স্ক্রিন আসবে। এখান থেকে Yes বাটনের ওপর ক্লিক করে Uninstall করা শুরু করো।

ধাপ ৫

এখন পাশে দেওয়া স্ক্রিনের মতো একটি স্ক্রিন আসবে। এখান থেকে Yes বাটনে ক্লিক করো।

ধাপ ৬

এখন ফাইলটি আন-ইন্সটল হওয়া শুরু হবে এবং ডান পাশে দেওয়া ছবির মতো সবুজ বার দেখা যাবে। বার-টি সম্পূর্ণ সবুজ হলেই Foxit PDF Reader আন-ইন্সটল হয়ে যাবে।

ধাপ ৭

আন-ইনসটলেশন শেষ হলে ডান পাশের মতো স্ক্রিনে লেখা আসবে। OK চেপে আন-ইনসটলেশন সম্পন্ন করো।

হাতে-কলমে কম্পিউটার শিক্ষা

মাল্টিমিডিয়া সফটওয়‍্যার ব্যবহার করা

এখানে মাল্টিমিডিয়া সফটওয়‍্যারের ব্যবহার দেখানোর জন্য VLC মিডিয়া প্লেয়ারের সাহায্যে একটি ভিডিও কীভাবে চালু করতে হয় তা দেখানো হলো-

১. প্রথমে কম্পিউটারের যেখানে কাঙ্ক্ষিত ভিডিওটি আছে তা খুঁজে বের করো।

২. এবার ভিডিওটির ওপর মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করো। তাহলে একটি ফ্লাই-আউট মেন্যু আসবে। এখান থেকে Play with VLC media player-এ ক্লিক করো।

৩. ক্লিক করার সাথে সাথে ভিডিওটি চালু হয়ে যাবে। ভিডিও প্লেয়ারের সবার ডানে উপরে থাকা ক্রস (X) চিহ্নে ক্লিক করলে ভিডিও প্লেয়ারটি বন্ধ হয়ে যাবে।

এভাবে VLC মিডিয়া প্লেয়ারের সাহায্যে তুমি যেকোনো গান, ভিডিও চালিয়ে উপভোগ করতে পারবে।

অনুশীলনী

ক. প্রতিটি তথ্যের পাশে সত্য হলে 'স' আর মিথ্যা হলে 'মি' লেখো।

১. অ্যাপল নাম্বার একটি ব্রাউজার সফটওয়্যার।

২. কুইক অ্যাকসেস টুলবারে নিজের প্রয়োজনীয় ফিচার চাইলে যুক্ত করা যায়।

৩. এক্সেলের স্প্রেডশিটে দুইটি স্কুলবার থাকে।

৪. আইকনে ক্লিক করলে বার চার্টের অনেকগুলো অপশন পাওয়া যায়

৫. Ctrl ও ১ একসাথে চাপলে যেকোনো ফাইল দ্রুত সেভ করা যায়

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও।

১. স্প্রেডশিট কী?

২. মাইক্রোসফট এক্সেল-এ সেল কী জিনিস?

৩. মাইক্রোসফট এক্সেল-এর একটি স্প্রেডশিটে কয়টি রো ও কয়টি কলাম থাকে?

8. =MAX(E2:E10) ফর্মুলাটি দিয়ে তুমি কী বোঝ?

৫. ∑ AutoSum-এর কাজ কী?

গ. লাবের কাজ ১: স্কুলের কম্পিউটার ল্যাবে শিক্ষকের সহায়তায় মাইক্রোসফট এক্সেল ব্যবহার করে নিচের কাজগুলো করো-

১. প্রদত্ত সংখ্যাগুলো সূত্রের সাহায্যে যোগ করো: 15, 35, 55 এবং 85

২. প্রদত্ত সংখ্যাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো সংখ্যাটি বের করো: 110, 220, 50 এবং 500

৩. প্রদত্ত সংখ্যাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোটো সংখ্যাটি বের করো: 800, 810, 805 এবং 815

৪. একটি স্কুলের ২য় থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের তালিকা দেওয়া আছে। তালিকাটি পাই চার্টের মাধ্যমে দেখাও:

Class 2

50

Class 3

45

Class 4

65

Class 5

35

ঘ. ল্যাবের কাজ ২: VLC মাল্টিমিডিয়া প্লেয়ার ব্যবহার করে কম্পিউটারে থাকা একটি ভিডিও চালু করে দেখাও।

নিজে করি

১. পঞ্চম শ্রেণির একটি ক্লাসের ১০ জন শিক্ষার্থীর ওজন নিচে দেওয়া হলো। মাইক্রোসফট এক্সেল ব্যবহার করে তাদের মোট ওজন বের করো।

৩১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৮, ২৪, ৩০, ২৮, ৩১, ২৫

২. তোমার বার্ষিক পরীক্ষার পাঁচটি বিষয়ের নম্বর দেওয়া হলো। মাইক্রোসফট এক্সেল-এর সাহায্যে তুমি মোট কত নম্বর পেলে তা বের করো (প্রতিটি বিষয়ের ওপর ১০০-তে পরীক্ষা হয়েছে)।

|  |  |
| --- | --- |
| বাংলা (Bangla) | ৮৫ |
| গণিত (Mathematics) | ৯৪ |
| ইংরেজি (English) | ৯৬ |
| বিজ্ঞান (Science) | ৮৭ |
| কম্পিউটার (Computer) | ৯৮ |

৩. একটি কারখানার দশজন কর্মচারীর দৈনিক আয়ের পরিমাণ (টাকায়) দেওয়া হলো। মাইক্রোসফট এক্সেল-এর মাধ্যমে কার আয় সবচেয়ে বেশি এবং কার আয় সবচেয়ে কম তা বের করো।

|  |  |
| --- | --- |
| নাম (Name) | টাকার পরিমাণ (Amount) |
| আহাদ (Ahad) | ৬০০ |
| হাবিব (Habib) | ৮৫০ |
| মাকসুদ (Maksud) | ৬৫০ |
| আনিকা (Anika) | ২৫০ |
| মনোয়ার (Monowar) | ৪০০ |
| নোমান (Noman) | ৮০০ |
| দীপ্তি (Dipty) | ৯০০ |
| সাইফুল (Saiful) | ৪৫০ |
| রাসেল (Rasel) | ৭৫০ |
| যায়েদ (Zayed) | ৪০০ |

৪. ওপরের তালিকাটি একটি পাই চার্টের মাধ্যমে দেখাও। শেষে ফাইলটি 'My Excel Work' নামে সেভ করো।

[নির্দেশনা: মাউসের সাহায্যে চার্টটি সিলেক্ট করার সময় তালিকার সবার ওপরে থাকা Name-এর সেলসহ সিলেক্ট করো]

৫. অভিভাবক বা শিক্ষকের সহায়তায় VLC মিডিয়া প্লেয়ারটি কম্পিউটারে ইন্‌সটল করো। [নির্দেশনা: শিক্ষক বা অভিভাবকের সাহায্যে VLC মিডিয়া প্লেয়ারটি শুরুতে ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে নিবে।

প্রযুক্তি দুনিয়ার মজাদার ও চমকপ্রদ তথ্য

• আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয় এমন একটি কম্পিউটার তৈরি করেছে যা মানুষের হাসি আসল না নকল তা শনাক্ত করতে পারে।

• প্রথম আবিষ্কৃত মাউস কাঠের তৈরি ছিল।

• ১৯৩৬ সালে রাশিয়া একটি কম্পিউটার তৈরি করেছিল যা পানির সাহায্যে চলত।

• আমাদের কি-বোর্ডের অ্যালফাবেট কি-গুলো এলোমেলোভাবে সাজানো মনে হলেও আসলে এটি তৈরি করা হয়েছে আমাদের লেখার গতিকে কমানোর জন্য!

• পৃথিবীর সবচেয়ে বড় 2D প্রিন্টার হচ্ছে ইনফিনিটাস। এটি দৈর্ঘ্যে ১৬৫ ফুট ও প্রস্থে ৪০ ফুট।

• বাণিজ্যিকভাবে বিক্রির জন্য বানানো পৃথিবীর প্রথম হার্ড ডিস্ক হচ্ছে আইবিএম-৩৫০, যা ছিল একটি ছোট ফ্রিজের সমান।

ফায়ারফক্স ব্রাউজারের লোগোতে যে প্রাণীটি দেখা যায় তা কিন্তু ফক্স বা শিয়াল না, বরং লাল রঙের একটি পান্ডা।

প্রযুক্তি দুনিয়ার মজাদার ও চমকপ্রদ তথ্য

•

পৃথিবীর প্রথম প্রিন্টার হচ্ছে আইবিএম ৩৮০০ যা প্রতি মিনিটে ১১০০টি লাইন প্রিন্ট করতে পারতো

• বর্তমানে প্রতিদিন মানুষ প্রায় ৩৫০ কোটিবার গুগলের সার্চ ইঞ্জিনের সাহায্যে অনলাইনে তথ্য খোঁজে।

•

'টয় স্টোরি' পৃথিবীর প্রথম সিনেমা যা সম্পূর্ণ কম্পিউটার দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল।

• মানুষ সাধারণত প্রতি মিনিটে ২০ বার চোখের পলক ফেললেও কাম্পডটার ব্যবহারের সময় তা কমে প্রতি মিনিটে মাত্র ৭ বারে নেমে আসে।

• কম্পিউটারের জন্য প্রথম তৈরি করা গেম হলো স্পেসওয়ার (Spacewar), যা ১৯৬২ সালে তৈরি হয়।

• একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ প্রতি ঘণ্টায় মাউস ক্লিক করতে যে পরিমাণ শক্তি খরচ করে তা ৫৫ ফুট দূরত্ব হাঁটার সমান!

শব্দকোষ

ক্যালকুলেটর: ক্যালকুলেটর হচ্ছে গাণিতিক হিসাব-নিকাশের কাজে ব্যবহৃত একটি উপকরণ। এটি অনেক জটিল গাণিতিক সমস্যাও সহজে সমাধান করতে পারে।

ডিভাইস: ডিভাইস হচ্ছে এক ধরনের যন্ত্র যা দিয়ে এক বা একাধিক কাজ করা যায়। কম্পিউটার, মোবাইল, ক্যালকুলেটর ইত্যাদি সবই ডিভাইস।

ব্লুটুথ: অল্প দূরত্বে ফাইল আদান-প্রদানের মাধ্যম। এর সাহায্যে স্বল্প দূরত্বে যোগাযোগও করা যায়।

ওয়াইফাই: ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত হওয়ার একটি তারহীন মাধ্যম। এটি একটি নির্দিষ্ট জায়গায় থেকে ইন্টারনেট ব্যবহারে সাহায্য করে।

ভার্সন: ভার্সন বলতে সফটওয়‍্যারের সাথে থাকা একটি নম্বর বোঝায়। একটি সফটওয়‍্যারের ভার্সন সংখ্যা পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন কী কী সুবিধা যুক্ত করা হয়েছে তা বোঝা যায়।

ডাউনলোড; ডাউনলোড হচ্ছে ইন্টারনেটের সাহায্যে কোনো ফাইল কম্পিউটার বা মোবাইলে নেওয়ার পদ্ধতি। ডাউনলোড করা ফাইল পরে নিজের সুবিধামতো ব্যবহার করা যায়।

নোটিফিকেশন: কোনো কাজ বা ফলাফলের ব্যাপারে তাৎক্ষণিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সংক্ষিপ্ত তথ্য।

রিস্টোর: এটি একটি প্রক্রিয়া যাতে করে কোনো ফাইল, তথ্য বা সফটওয়‍্যারকে তার আগের অবস্থানে ফিরিয়ে নেওয়া যায়।

ফিচার: সফটওয়‍্যারের কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা আমাদের কাজে লাগে তাকে ফিচার বলে।

সিসি বা কার্বন কপি (Cc or Carbon Copy): ই-মেইলের একটি প্রযুক্তি যার সাহায্যে একাধিক মানুষকে একসাথে একটি ই-মেইল পাঠানো যায়।

রেফারেন্স: রেফারেন্স হলো একটি বিষয় সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য খোঁজার একটি উপায়। সাধারণত কোনো তথ্যের সাথে থাকা রেফারেন্সে ক্লিক করলে আরো তথ্য পাওয়া যায়।

ইন্‌সটল: এটি একটি প্রক্রিয়া যাতে করে কোনো সফটওয়‍্যারকে কম্পিউটার বা মোবাইলে ব্যবহারের উপযোগী করা হয়।